ইত্যাদির কারণে মার্জনা করা হয়েছে, তাদের গোনাহ্‌র পাল্লায় কিছুই থাকবে না। অপরদিকে কাফিরদের নেক আমলাও ঈমানের শর্ত বর্তমান না থাকায় পাল্লার ওজন হাল্কা হবে। গোনাহ্‌গার মুসলমানদের নেকীর পাল্লায়ও আমল থাকবে এবং গোনাহ্‌র পাল্লায়ও আমল থাকবে। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে স্পষ্টত কিছু বলা হয়নি; বরং কোরআন পাক সাধারণত তাদের শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কে নীরবই বলা যায়। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কোরআন অবতরণের সময় যেসব মু'মিন সাহাবী ছিলেন, তাঁরা সবাই কবিরা গোনাহ্ থেকে পবিত্রই ছিলেন। কারও দ্বারা কোন গোনাহ্ হয়ে গেলেও তিনি তওবা করেছেন। ফলে মাফ হয়ে গেছে।

কোরআন পাকের خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا আয়াতে এমন লোক-দের কথা বলা হয়েছে, যাদের নেক ও বদ আমল মিশ্র। তাদের সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ কিয়ামতের দিন যার নেকী গোনাহ্‌র চাইতে বেশি হবে---এক নেকী পরিমাণ বেশি হলেও সে জান্নাতে যাবে। পক্ষান্তরে যার গোনাহ্ নেকীর চাইতে বেশি হবে---এক গোনাহ্ বেশি হলেও সে দোযখে যাবে; কিন্তু এই মু'মিন গোনাহ্‌গারের দোযখে প্রবেশ পবিত্র করার উদ্দেশ্যে হবে; যেমন লোহা স্বর্ণ ইত্যাদি আগুনে ফেলে ময়লা ও মরিচা দূর করা হয়। দোযখের অগ্নি দ্বারা যখন তার গোনাহ্‌র মরিচা দূরী-করণ হবে, তখন সে জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত হবে এবং তাকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে। হযরত ইবনে আব্বাস আরও বলেন ঃ কিয়ামতের পাল্লা এমন নির্ভুল ওজন করবে যে, তাতে এক সরিষা পরিমাণও এদিক-সেদিক হবে না। যার নেকী ও গোনাহ্ পাল্লায় সমান সমান হবে, সে আ'রাফে প্রবেশ এবং দোযখ ও জান্নাতের মাঝখানে দ্বিতীয় নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। অবশেষে সে-ও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। —(মাযহারী)

ইবনে আব্বাসের এই উক্তিতে কাফিরদের উল্লেখ নেই, শুধু মু'মিন গোনাহ্‌গার-দের কথা আছে।

আসল ওজনের ব্যবস্থা ঃ কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং মু'মিন ও কাফির ব্যক্তিকে পাল্লায় রেখে ওজন করা হবে। কাফিরের কোন ওজনই হবে না, সে যত মোটা ও স্থূলদেহীই হোক না কেন।---(বুখারী, মুসলিম) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের আমলনামা ওজন করা হবে। তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান ও হাকিম এই বিষয়বস্তু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করে-ছেন। আরও কিছু রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের দুনিয়ার ওজনহীন ও দেহহীন আমলসমূহকে হাশরের ময়দানে সাকার অবস্থায় পাল্লায় রাখা হবে এবং ওজন করা হবে। তাবারানী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাসের ভাষ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যায়। শেষোক্ত উক্তির সমর্থনে আবদুর রাজ্জাক 'ফযলুল ইলম' গ্রন্থে ইব্‌রাহীম নাখয়ী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাতে বলা হয়েছে ঃ কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির আমলসমূহ ওজনের জন্য পাল্লায় রাখা হলে পাল্লা হাল্কা হবে। এরপর মেঘের ন্যায় এক বস্তু এনে তার নেকীর পাল্লায় রেখে দেওয়া হবে। ফলে, পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। তখন সে ব্যক্তিকে বলা হবে ঃ তুমি জান এটা কি? (যার দ্বারা পাল্লা ভারী হয়ে গেছে)। সে বলবে ঃ আমি জানি না। তখন বলা হবে ঃ এটা তোমার ইল্‌ম, যা তুমি অপরকে শিক্ষা দিতে। যাহাবী ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন শহীদদের রক্ত এবং আলিমদের কলমের কালি (যদ্দ্বারা তারা ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি লিখতেন), পরস্পরে ওজন করা হবে। আলিমদের কালির ওজন শহীদদের রক্তের চাইতে বেশি হবে।---(মাযহারী)

আমল ওজনের অবস্থা সম্পর্কিত তিন প্রকার রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ স্বয়ং মানুষকে তার সাথে রেখে ওজন করার মধ্যে কোন অবান্তরতা নেই। তাই তিন প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই।

كَالِحُونَ—وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ অভিধানে এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার ওষ্ঠদ্বয় মুখের দাঁতকে আবৃত করে না। এক ওষ্ঠ ওপরে উত্থিত এবং অপর ওষ্ঠ নিচে ঝুলে থাকে, ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে। এটা খুব বীভৎস আকার হবে। জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্ঠদ্বয়ও তদ্রূপ হবে এবং দাঁত খোলা ও বেরিয়ে থাকা অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হবে।

وَلَا تُكَلِّمُونِ---হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ এটা জাহান্নামীদের সর্বশেষ কথা হবে। এরপরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে, তারা কারও সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না; জন্তুদের ন্যায় একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করবে। বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেন ঃ কোরআনে জাহান্নামীদের পাঁচটি আবেদন উদ্ধৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে চারটির জওয়াব দেওয়া হয়েছে এবং পঞ্চমটির জওয়াবে لَا تُكَلِّمُونِ বলা হয়েছে। এটাই হবে তাদের শেষ কথা। এরপর তারা কিছুই বলতে পারবে না।---(মাযহারী)

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ

عِنْدَ رَبِّهٖ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾

(১১৬) অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ্, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। (১১৭) যে কেউ আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্য ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না। (১১৮) বলুন ঃ হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এসব বিষয়বস্তু যখন জানা গেল) অতএব (এ থেকে পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয় যে,) আল্লাহ্ মহিমান্বিত, তিনি বাদশাহ্ (এবং বাদশাহ্-ও) সত্যিকার। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই (এবং তিনি) মহান আরশের অধিপতি। যে ব্যক্তি (এ বিষয়ে প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর) আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন মাবূদের ইবাদত করে, যার (মাবূদ হওয়া) সম্পর্কে তার কাছে কোন প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে হবে, (যার অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে,) নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না। (বরং চিরকাল আযাব ভোগ করবে এবং যখন আল্লাহ্ তা'আলার শান এই, তখন) আপনি (এবং অন্যরাও) বলুন ঃ হে আমার পালনকর্তা, (আমার ত্রুটিসমূহ) ক্ষমা করুন ও (সর্বাবস্থায় আমার প্রতি) রহম করুন (জীবিকায়, ইবাদতের তওফীক-দানে, পরকালের মুক্তির ব্যাপারে এবং জান্নাত দানের ব্যাপারেও।) রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মু'মিনূনের সর্বশেষ আয়াতসমূহ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا থেকে নিয়ে শেষ সূরা পর্যন্ত বিশেষ ফযীলত রাখে। বগভী ও সালাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি জনৈক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কানে এই আয়াতসমূহ পাঠ করলে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করে। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি তার কানে কি পাঠ করেছ? আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বললেন ঃ আমি এই আয়াতগুলো পাঠ করেছি। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সেই আল্লাহ্র কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি এই আয়াত-গুলো পাহাড়ের ওপর পাঠ করে দেয়, তবে পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যেতে পারে।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ—এখানে-اغفر ও ارحم উভয়ের مفعول তথা কর্মপদ উল্লেখ করা হয়নি অর্থাৎ কি ক্ষমা করা হবে এবং কিসের প্রতি রহম করা হবে, তা বলা হয়নি। এতে করে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ মাগফিরাতের দোয়া ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে এবং রহমতের দোয়া প্রত্যেক উদ্দিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। কেননা, ক্ষতি দূরীকরণ ও উপকার আহরণ মানব-জীবন ও তার উদ্দেশ্যসমূহের নির্যাস। উভয়টিই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।—(মাযহারী)। রসূলুল্লাহ্ (সা) নিষ্পাপ ও রহমতপ্রাপ্তই ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, তোমাদের এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান হওয়া উচিত।---(কুরতুবী)

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ—সূরা মু'মিনূনের সূচনা قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ আয়াত দ্বারা হয়েছিল এবং সমাপ্তি لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, ফালাহ্ অর্থাৎ পরিপূর্ণ সফলতা মু'মিনগণেরই প্রাপ্য এবং কাফিররা এ থেকে বঞ্চিত।

سورة النور

সূরা আন্-নূর

মদীনায় অবতীর্ণ, রুকূ ; ৬৫ আয়াত

সূরা নূরের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ এই সূরার অধিকাংশ বিধান সতীত্বের সংরক্ষণ ও পর্দাপুশিদা সম্পর্কিত। এরই পরিপূরক হিসাবে ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা আল-মু'মিনূনে মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য যেসব গুণের ওপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছিল, তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ ছিল যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এটাই সতীত্ব অধ্যায়ের সারমর্ম। এ সূরায় সতীত্বকে গুরুত্বদানের জন্যে এতদসম্পর্কিত বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই নারীদেরকে এই সূরা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ নির্দেশ রয়েছে।

হযরত উমর ফারূক (রা) কূফাবাসীদের নামে এক ফরমানে লিখেছেন : علموا نساءكم سورة النور অর্থাৎ তোমাদের নারীদেরকে সূরা আন-নূর শিক্ষা দাও।

এ সূরার ভূমিকা যে ভাষায় রাখা হয়েছে ; অর্থাৎ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا এটাও এ সূরার বিশেষ গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ①

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ

بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ

عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ②

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) এটা একটা সূরা, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, দায়িত্বে অপরিহার্য করেছি। এবং এতে আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (২) ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে কশাঘাত কর। আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরকরণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়,

যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকে; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এটা একটা সূরা, যা (অর্থাৎ যার ভাষাও) আমি (ই) অবতীর্ণ করেছি, যা (অর্থাৎ যার অর্থসম্ভার তথা বিধানাবলীও) আমি (ই) নির্ধারিত করেছি (ফরয হোক কিংবা ওয়াজিব, মনদূব হোক কিংবা মুস্তাহাব) এবং আমি (এসব বিধান বোঝাবার জন্য) এতে (অর্থাৎ এই সূরায়) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বোঝ এবং আমল কর)। ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ (উভয়ের বিধান এই যে,) তাদের প্রত্যেককে একশ করে দুররা মার এবং তাদের ব্যাপারে তোমাদের মনে যেন দয়ার উদ্রেক না হয় (যেমন দয়ার বশবর্তী হয়ে ছেড়ে দাও কিংবা শাস্তি হ্রাস করে দাও), যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। তাদের শাস্তির সময় মুসলমানদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে (যাতে তাদের লাঞ্ছনা হয় এবং দর্শক ও শ্রোতারা শিক্ষা গ্রহণ করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরার প্রথম আয়াত ভূমিকাস্বরূপ, যদ্দ্বারা এর বিধানাবলীর বিশেষ গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বিধানাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যভিচারের শাস্তি---যা সূরার উদ্দেশ্য ---উল্লেখ করা হয়েছে। সতীত্ব ও তজ্জন্যে দৃষ্টির হিফাযত, অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গৃহে যাওয়া ও দৃষ্টিপাত করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানাবলী পরে বর্ণিত হবে। ব্যভিচার সতর্কতার এমন বাধা ডিঙ্গিয়ে সতীত্বের বিপক্ষে চরম সীমায় উপনীত হওয়া এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার নামান্তর। এ কারণেই ইসলামে মানবিক অপরাধসমূহের যেসব শাস্তি কোরআনে নির্ধারিত রয়েছে, তন্মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি সবচাইতে কঠোর ও অধিক। ব্যভিচার স্বয়ং একটি বৃহৎ অপরাধ; তদুপরি সে নিজের সাথে আরও শত শত অপরাধ নিয়ে আসে এবং সমগ্র মানবতার ধ্বংসের আকারে এর ফলাফল প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে যত হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়; অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার কারণ কোন নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক। তাই সূরার প্রথমে এই চরম অপরাধ ও নির্লজ্জতার মূলোৎপাটনের জন্য এর শরীয়তানুগ শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

ব্যভিচার একটি মহা অপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি; তাই শরীয়তে এর শাস্তিও সর্ববৃহৎ রাখা হয়েছে ঃ কোরআন পাক ও মুতাওয়াতির হাদীস চারটি অপরাধের শাস্তি ও তার পন্থা স্বয়ং নির্ধারিত করেছে এবং কোন বিচারক ও শাসনকর্তার মতামতের ওপর ন্যস্ত করেনি। এসব নির্দিষ্ট শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'হুদূদ' বলা হয়। এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধের শাস্তি এভাবে নির্ধারিত করা হয়নি; বরং

শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে পরিমাণ শাস্তিকে অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট মনে করে, সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে পারে। এ ধরনের শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'তা'যীরাত' (দণ্ড) বলা হয়। হুদূদ চারটি ঃ চুরি, কোন সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, মদ্যপান করা এবং ব্যভিচার করা। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধই স্বস্থলে গুরুতর, জগতের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য মারাত্মক এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি ; কিন্তু সবগুলোর মধ্যেও ব্যভিচারের অশুভ পরিণতি মানবিক সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন মারাত্মক আঘাত হানে, তেমনটি বোধ হয় অন্য কোন অপরাধে নেই।

(১) কোন ব্যক্তির কন্যা, ভগিনী ও স্ত্রীর ওপর হাত রাখা তাকে ধ্বংস করার নামান্তর। সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও নিজের সর্বস্ব কোরবানী করা ততটুকু কঠিন নয়, যতটুকু তার অন্দরমহলের ওপর হাত রাখা কঠিন। এ কারণেই দুনিয়াতে রোজই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় যে, যাদের অন্দরমহলের ওপর হাত রাখা হয়, তারা জীবন পণ করে ব্যভিচারীর প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয় এবং এই প্রতিশোধস্পৃহা বংশের পর বংশকে বরবাদ করে দেয়।

(২) যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, সেখানে কারও বংশই সংরক্ষিত থাকে না ; জননী, ভগিনী, কন্যা ইত্যাদির সাথে বিবাহ হারাম ; যখন এসব সম্পর্কও বিলীন হয়ে যায়, তখন আপন কন্যা ও ভগিনীকেও বিবাহে আনার সম্ভাবনা আছে, যা ব্যভিচারের চাইতেও কঠোরতর অপরাধ।

(৩) চিন্তা করলে দেখা যায় যে, জগতের যেখানেই অশান্তি ও অনর্থ দেখা দেয়, তার অধিকাংশ কারণই নারী এবং তার চাইতে কম কারণ অর্থসম্পদ। যে আইন নারী ও ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে না দেয়, সেই আইনই বিশ্বশান্তির রক্ষাকবচ হতে পারে। এটা ব্যভিচারের দ্বাবতীয় অনিষ্ট ও অপকারিতা সন্নিবেশিত করা ও বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান নয়। মানব সমাজের জন্য এর ধ্বংসকারিতা জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এ কারণেই ইসলাম ব্যভিচারের শাস্তিকে অন্যান্য অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোরতর করেছে। আলোচ্য আয়াতে এই শাস্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي

فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ —এতে ব্যভিচারিণী নারীকে অগ্রে এবং ব্যভিচারী পুরুষকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্তি উভয়ের একই। বিধানাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পুরুষদেরকে সম্বোধন করে আদেশ দান করা হয়, নারীরাও এতে প্রসঙ্গত অন্তর্ভুক্ত থাকে ; তাদেরকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনই মনে করা হয় না। সমগ্র কোরআনে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا —পুংলিঙ্গ

পদবাচ্য ব্যবহার করে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নারীরাও উল্লেখ ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্ভবত এর রহস্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা নারী জাতিকে সংগোপনে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাদের আলোচনাকেও পুরুষদের আলোচনার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে। তবে এই পদ্ধতিদৃষ্টে কেউ এরূপ সন্দেহ করতে পারত যে, এসব বিধান পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট, নারীরা এগুলো থেকে মুক্ত। তাই বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহে স্বতন্ত্রভাবে নারীদের উল্লেখও করে দেওয়া হয়; যেমন أَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ—যে ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের উল্লেখ উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে স্বাভাবিক ক্রম এরূপ হয় যে, অগ্রে পুরুষ ও পশ্চাতে নারীর উল্লেখ থাকে। চুরির শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا—বলা হয়েছে। এতে চোর পুরুষকে চোর নারীর অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমতঃ নারীর উল্লেখ প্রসঙ্গত রাখাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং স্পষ্টত উল্লেখকেই উপযুক্ত মনে করা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ নারীকে পুরুষের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে, এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। নারী অবলা এবং তাকে স্বভাবতই দয়ার পাত্রী মনে করা হয়। তাকে স্পষ্টত উল্লেখ করা না হলে কেউ সন্দেহ করতে পারত যে, সম্ভবত নারী এই শাস্তির আওতাধীন নয়। নারীকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ব্যভিচার একটি নির্লজ্জ কাজ। নারী দ্বারা এটা সংঘটিত হওয়া চরম নির্ভীকতা ও ঔদাসীন্যের ফলেই সম্ভবপর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তার স্বভাবে মজ্জাগতভাবে লজ্জা ও সতীত্ব সংরক্ষণের শক্তিশালী প্রেরণা গচ্ছিত রেখেছেন এবং তার হিফাযতের অনেক ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। কাজেই তার পক্ষ থেকে এ কাজ ঘটা পুরুষের তুলনায় অধিকতর অন্যায়। চোরের অবস্থা এর বিপরীত। পুরুষকে আল্লাহ্ তা'আলা উপার্জনের শক্তি দিয়েছেন। তাকে গায়ে খেটে নিজের প্রয়োজনাদি মিটানোর সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। এগুলো বাদ দিয়ে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করা পুরুষের জন্য খুবই লজ্জা ও দোষের কথা। নারীর অবস্থা তদ্রূপ নয়। সে চুরি করলে পুরুষের তুলনায় তা লঘু ও স্বল্পস্তরের অপরাধ হবে।

فَاجْلِدُوْا—جلد শব্দের অর্থ চাবুক মারা। শব্দটি جلد (চামড়া) থেকে উদ্ভূত। কারণ, চাবুক সাধারণত চামড়া দ্বারা তৈরি করা হয়। কোন কোন তফসীরকার বলেনঃ جلد শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই কশাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংস পর্যন্ত না পৌঁছা চাই। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) কশাঘাতের শাস্তিতে কার্যের মাধ্যমে এই মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন

যে, চাবুক যেন এত শক্ত না হয় যে, মাংস পর্যন্ত উপড়ে যায় এবং এমন নরমও যেন না হয় যে, বিশেষ কোন কষ্টই অনুভূত না হয়। এস্থলে অধিকাংশ তফসীরবিদ এই হাদীসটি সনদ ও ভাষাসহ উল্লেখ করেছেন।

একশ কশাঘাতের উল্লিখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট; বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা: স্মর্তব্য যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং লঘু থেকে গুরুতরের দিকে উন্নীত হয়েছে; যেমন মদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কেও এমনি ধরনের পর্যায়ক্রমিক বিধান স্বয়ং কোরআনে বর্ণিত আছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিধান সূরা নিসার ১৫ ও ১৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতদ্বয় এই:

وَاللّٰتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝

—"তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজন পুরুষকে সাক্ষী আন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন পথ করে দেন এবং তোমাদের মধ্যে যে পুরুষ এই অপকর্ম করে তাকে শাস্তি দাও। অতঃপর সে যদি তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়, তবে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তওবা কবুলকারী, দয়ালু।" এই আয়াতদ্বয়ের পূর্ণ তফসীর সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তির প্রাথমিক যুগ সম্মুখে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে এখানে আয়াতদ্বয়ের পুনরুল্লেখ করা হল। আয়াতদ্বয়ে প্রথমত ব্যভিচার প্রমাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার হবে। দ্বিতীয়ত ব্যভিচারের শাস্তি নারীর জন্য গৃহে আবদ্ধ রাখা এবং উভয়ের জন্য কষ্ট প্রদান উল্লিখিত হয়েছে। এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত এই বিধান সর্বশেষ নয়—ভবিষ্যতে অন্য বিধান আসবে। আয়াতের أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا অংশের মর্ম তাই।

উল্লিখিত শাস্তিতে নারীদেরকে গৃহে অন্তরীণ রাখাকে তখনকার মত যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং উভয়কে শাস্তি প্রদানের শাস্তিও যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু

এই শাস্তি ও কষ্ট প্রদানের কোন বিশেষ আকার, পরিমাণ ও সীমা বর্ণনা হয়নি। বরং কোরআনের ভাষা থেকে জানা যায় যে, ব্যভিচারের প্রাথমিক শাস্তি শুধু 'তা'যীর' তথা দণ্ডবিধির আওতাধীন ছিল, যার পরিমাণ শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়নি; বরং বিচারক ও শাসনকর্তার বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই আয়াতে 'কষ্ট প্রদানের' অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এসব অপরাধীর জন্য অন্য ধরনের শাস্তি প্রবর্তিত হওয়া অসম্ভব নয়। সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস মন্তব্য করলেন: সূরা নিসায় أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا— বলে যে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য অন্য কোন পথ করবেন, সূরা নূরের এই আয়াত সেই পথ ব্যক্ত করে দিয়েছে; অর্থাৎ পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য একশ কশাঘাত করার শাস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছে। এতদসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস একশ কশাঘাতের শাস্তিকে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করে বললেন: يعنى الرجم للثيب والجلد للبكر অর্থাৎ সেই পথ ও ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ এই যে, বিবাহিত পুরুষ ও নারী এ অপরাধ করলে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে এবং অবিবাহিত পুরুষ ও নারী করলে একশ কশাঘাত করা হবে।

বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে কোনরূপ বিবরণ ছাড়াই ব্যভিচারের শাস্তি একশ কশাঘাত বর্ণিত হয়েছে। এই বিধান যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা—একথা হযরত ইবনে আব্বাস কোন হাদীসের প্রমাণ থেকে জেনে থাকবেন। সেই হাদীসটি সহীহ মুসলিম মসনদে আহমদ, সুনানে নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় ওবাদা ইবনে সামিতের রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة
وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم -

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: আমার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন কর, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্য সূরা নিসায় প্রতিশ্রুত পথ সূরা নূরে বাৎলে দিয়েছেন। তা এই যে, অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা।—(ইবনে কাসীর)

সূরা নূরে উল্লিখিত অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি একশ কশাঘাতের সাথে এই হাদীসে একটি বাড়তি সাজা উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, পুরুষকে এক বছরের

জন্য দেশান্তরিত করতে হবে। দেশান্তরিত করার এই শাস্তি পুরুষের জন্য একশ কশাঘাতের ন্যায় অপরিহার্য, না বিচারকের বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল যে, তিনি প্রয়োজনবোধ করলে এক বছরের জন্য দেশান্তরিতও করে দেবেন—এ ব্যাপারে ফিকাহ্-বিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে শেষোক্ত মতই নির্ভুল; অর্থাৎ বিচারকের বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত এই হাদীসে বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা—এর আগে একশ' কশাঘাতের শাস্তিও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য হাদীস এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের কার্যপ্রণালী থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, উভয় প্রকার শাস্তি একত্রিত হবে না। বিবাহিতকে শুধু প্রস্তরাঘাতে হত্যাই করা হবে। এই হাদীসে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এতে أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا আয়াতের তফসীর করেছেন।

তফসীরে সূরা নূরের আয়াতে বিধৃত একশ কশাঘাতের ওপর কতিপয় অতিরিক্ত বিষয়ও সংযুক্ত হয়েছে। প্রথম, একশ কশাঘাতের শাস্তি অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া; দ্বিতীয়, এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করা এবং তৃতীয়, বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার বিধান। বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আয়াতের ওপর রসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব বিষয়ের বাড়তি সংযোজন করেছেন, এগুলোও আল্লাহ্র ওহী ও আল্লাহ্র আদেশ বলেই ছিল। إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ পয়গম্বর ও তাঁর কাছ থেকে যারা সরাসরি শোনে, তাদের পক্ষে পঠিত ওহী অর্থাৎ কোরআন ও অপঠিত ওহী উভয়ই সমান। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের বিপুল সমাবেশের সামনে এই বিধান কার্যে পরিণত করেছেন। মা'এয ও গামেদিয়ার ওপর তিনি প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান জারি করেছেন, যা সব হাদীসগ্রন্থে সহীহ্ সনদসহ বর্ণিত আছে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইবনে খালেদ জোহানীর রেওয়ায়তে আছে, জনৈকা বিবাহিতা মহিলার সাথে তার অবিবাহিত চাকর ব্যভিচার করে। ব্যভিচারীর পিতা তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঘটনা প্রমাণিত হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ অর্থাৎ আমি তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী করব। অতঃপর তিনি আদেশ দিলেন যে, ব্যভিচারী অবিবাহিত ছেলেকে একশ কশাঘাত কর। তিনি বিবাহিতা মহিলাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার জন্য হযরত উনায়সকে আদেশ দিলেন। উনায়স নিজে মহিলার জবানবন্দি নিলে সেও স্বীকারোক্তি করল। তখন তার ওপর প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান প্রয়োগ করা হল।—(ইবনে কাসীর)

এই হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) একজনকে একশ কশাঘাত এবং অপরজনকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি দিয়েছেন। তিনি উভয় শাস্তিকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা বলেছেন; অথচ নূরের আয়াতে শুধু একশ কশাঘাতের শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে—প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি উল্লিখিত নেই। কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা

রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে এই আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যা পুরাপুরি বলে দিয়েছিলেন। কাজেই এই তফসীর আল্লাহ্র কিতাবেরই অনুরূপ; যদিও তার কিছু অংশ আল্লাহ্র কিতাবে উল্লিখিত ও পঠিত নেই। বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর ভাষণ হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়তে উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিমের ভাষায়ঃ

قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعث محمدا صلعم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله عليه اية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل مانجد الرجم فى كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وان الرجم فى كتاب الله حق على من زنا اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف

হযরত উমর ফারূক (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব নাযিল করেন। কিতাবে যেসব বিষয় অবতীর্ণ হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, যা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশংকা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ একথা বলতে না শুরু করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্র কিতাবে পাই না। ফলে সে একটি ধর্মীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। মনে রেখ, প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্র কিতাবে সত্য এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রযোজ্য---যদি ব্যভিচারের শরীয়ত সম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত হয় অথবা গর্ভ ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়।---(মুসলিম ২য় খণ্ড, ৬৫ পৃঃ)

এই রেওয়ায়েত সহীহ্ বুখারীতে আরও বিস্তারিত বর্ণিত আছে।---(বুখারী, ২য় খণ্ড ১০০৯ পৃঃ) নাসায়ীতে এই রেওয়ায়েতের ভাষা এরূপঃ

انا لانجد من الرجم بدا فانه حد من حدود الله الا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولولا ان يقول قائلون ان عمر زاد فى كتاب الله مالبس فيه لكتبت فى ناحية المصحف وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده -

"শরীয়তের দিক দিয়ে আমরা ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে বাধ্য। কেননা, এটা আল্লাহ্‌র অন্যতম হদ। মনে রেখ, রসূলুল্লাহ্ (সা) রজম করেছেন এবং আমরা তাঁর পরেও রজম করেছি। যদি এরূপ আশংকা না থাকত যে, লোকে বলবে উমর আল্লাহ্‌র কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছেন, তবে আমি কোরআনের এক প্রান্তে এটা লিখে দিতাম। উমর ইবনে খাত্তাব, আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং অমুক অমুক সাক্ষী যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরা রজম করেছি।—(ইবনে কাসীর)

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর এই ভাষণ থেকে বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, সূরা নূরের আয়াত ছাড়া রজম সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র আয়াত আছে। কিন্তু হযরত উমর সেই আয়াতের ভাষা প্রকাশ করেননি। তিনি একথাও বলেননি যে, সেই স্বতন্ত্র আয়াতটি কোরআনে কেন নেই এবং তা পঠিত হয় না কেন? তিনি শুধু বলেছেন, আমি আল্লাহ্‌র কিতাবে সংযোজন করেছি এই মর্মে দোষারোপের আশংকা না থাকলে আমি আয়াতটি কোরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম—(নাসায়ী)

এই রেওয়ায়েতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সেটা যদি বাস্তবিকই কোরআনের আয়াত হয় এবং পাঠ করা ওয়াজিব হয়, তবে হযরত উমর মানুষের নিন্দাবাদের ভয়ে একে কিরূপে ছেড়ে দিলেন, অথচ ধর্মের ব্যাপারে তাঁর কঠোরতা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এখানে আরও প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত উমর একথা বলেননি—আমি এই আয়াতকে কোরআনে দাখিল করে দিতাম; বরং বলেছেন, আমি একে কোরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম।

এসব বিষয় ইঙ্গিত বহন করে যে, হযরত উমর (রা) সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াতের যে তফসীর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে শুনেছিলেন, যাতে তিনি একশ কশাঘাত করার বিধান অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন এবং বিবাহিতের জন্য রজমের বিধান দিয়েছিলেন, সেই তফসীরকে এবং তদনুযায়ী রসূল-(সা)-র কার্যপ্রণালীকে তিনি আল্লাহ্‌র কিতাব ও কিতাবের আয়াত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর মর্ম এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই তফসীর ও বিবরণ কিতাবের হুকুম রাখে, স্বতন্ত্র আয়াত নয়। নতুবা এই পরিত্যক্ত আয়াতকে কোরআনের অন্তর্ভুক্ত করে দিতে কোন শক্তিই তাঁকে বাধা দিতে পারত না। প্রান্তে লিখে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশও এ বিষয়ের প্রমাণ যে, সেটা স্বতন্ত্র কোন আয়াত নয়; বরং সূরা নূরের আয়াতের কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এস্থলে স্বতন্ত্র আয়াত বলা হয়েছে। এসব রেওয়ায়েত সনদ ও প্রমাণের দিক দিয়ে এরূপ নয় যে, এগুলোর ভিত্তিতে কোরআনে একে সংযুক্ত করা যায়। ফিকাহ্‌বিদগণ একে "তিলাওয়াত মনসূখ, বিধান মনসূখ নয়" এর দৃষ্টান্তে পেশ করেছেন। এটা নিছক দৃষ্টান্তই মাত্র। এতে প্রকৃতপক্ষে এর কোরআনী আয়াত হওয়া প্রমাণিত হয় না।

সারকথা এই যে, সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষের একশ কশাঘাতের শাস্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ব্যাখ্যা ও তফসীরের

ভিত্তিতে অবিবাহিতদের জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিতদের শাস্তি রজম। এই বিবরণ আয়াতে উল্লিখিত না থাকলেও যে পবিত্র সত্তার প্রতি আয়াত নাযিল হয়েছিল, তাঁর পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত আছে। শুধু মৌখিক শিক্ষাই নয়; বরং সাহাবায়ে কিরামের সামনে একাধিকবার বাস্তবায়নও প্রমাণিত রয়েছে। এই প্রমাণ আমাদের নিকট পর্যন্ত 'তাওয়াতুর' তথা সন্দেহাতীত বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে পৌঁছেছে। তাই বিবাহিতা পুরুষ ও নারীর এই বিধান প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধান। একথাও বলা যায় যে, রজমের শাস্তি মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত। হযরত আলী (রা) থেকে একথাই বর্ণিত আছে। উভয় বক্তব্যের সারমর্মই একরূপ।

জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ এ স্থলে বিবাহিত ও অববাহিত শব্দগুলো শুধু সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। আসলে 'মুহ্‌সিন' ও 'গায়র মুহ্‌সিন' অথবা 'সাইয়েব' ও 'বিক্‌র' শব্দই হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় মুহ্‌সিন এমন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই অর্থ বোঝানো হয়। তবে সহজভাবে ব্যক্ত-করণের উদ্দেশ্যে অনুবাদে শুধু বিবাহিত বলা হয়।

ব্যভিচারের শাস্তির পর্যায়ক্রমিক তিন স্তর ঃ উপরোক্ত রেওয়ায়েত ও কোরআনী আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, প্রথমে ব্যভিচারের শাস্তি লঘু রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিজ বিবেচনা অনুযায়ী অপরাধী পুরুষ ও নারীকে কষ্ট প্রদান করবে এবং নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখবে। এই বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরের বিধান সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে যে, উভয়কে একশ করে চাবুক মারতে হবে। তৃতীয় স্তরের বিধান রসূলুল্লাহ্ (সা) উল্লিখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন যে, অবিবাহিতদের বেলায় শুধু একশ' কশাঘাত করতে হবে। কিন্তু বিবাহিতদের শাস্তি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা।

ইসলামী আইনে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলীও কড়া রাখা হয়েছে ঃ উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি সর্বাধিক কঠোর। এতদসঙ্গে ইসলামী আইনে এই অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলীও অত্যন্ত কড়া আরোপ করা হয়েছে, যাতে সামান্যও ত্রুটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যভিচারের চরম শাস্তি হদ মাফ হয়ে শুধু দণ্ডমূলক শাস্তি অপরাধ অনুযায়ী অবশিষ্ট থেকে যায়। অন্যান্য ব্যাপারাদিতে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু ব্যভিচারের হদ জারি করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষীর চাক্ষুষ ও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য জরুরী; যেমন সূরা নিসার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই সাক্ষ্য দ্বিতীয় সাবধানতা ও কঠোরতা এই যে, যদি সাক্ষ্যের জরুরী কোন শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে সাক্ষ্যদাতাদের নিস্তার নেই। ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের ওপর 'হদ্দে কযফ' জারি করা হবে; অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। তাই সামান্য সন্দেহ থাকলে কোন ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দানে অগ্রসর হবে না। যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারের প্রমাণ

না থাকে, কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা দুইজন পুরুষ ও নারীর অবৈধ অবস্থায় পরিলক্ষিত হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে বিচারক তাদের অপরাধের অনুপাতে দণ্ডমূলক শাস্তি বেত্রাঘাত ইত্যাদি জারি করতে পারেন। এর শর্তাবলী সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাবলী ফিকাহ্ গ্রন্থাদিতে দ্রষ্টব্য।

পুরুষ কোন পুরুষের সাথে অথবা জন্তুর সাথে অপকর্ম করলে তা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা এবং এর শাস্তিও ব্যভিচারের শাস্তি কিনা, এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা নিসার তফসীরে করা হয়েছে। তা এই যে, অভিধানে ও পরিভাষায় যদিও একে ব্যভিচার বলা হয় না, তাই হদ প্রযোজ্য নয়; কিন্তু এর শাস্তিও কঠোরতায় ব্যভিচারের শাস্তির চাইতে কম নয়। সাহাবায়ে কিরাম এরূপ ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার শাস্তি দিয়েছেন।

لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ —ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর বিধায় শাস্তি প্রয়োগকারীদের তরফ থেকে দয়াপরবশ হয়ে শাস্তি ছেড়ে দেওয়ার কিংবা হ্রাস করার সম্ভাবনা আছে। তাই সাথে সাথে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান কার্যকরকরণে অপরাধীদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। দয়া অনুকম্পা ও ক্ষমা সর্বত্র প্রশংসনীয়; কিন্তু অপরাধীদের প্রতি দয়া করার ফল সমগ্র মানব জাতির প্রতি নির্দয় হওয়া। তাই এটা নিষিদ্ধ ও অবৈধ।

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ —অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করার সময় মুসলমানদের একটি দল উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলামে সব শাস্তি বিশেষত হুদুদ প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাতে দর্শকরা শিক্ষালাভ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে একদল লোককে উপস্থিত থাকার আদেশ দান ব্যভিচারের শাস্তির বৈশিষ্ট্য।

ইসলামে প্রথম পর্যায়ে অপরাধ গোপন রাখার বিধান আছে; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেলে অপরাধীদের পূর্ণ লাঞ্ছনাও সাক্ষাৎ প্রজ্ঞা: অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজকারবার দমনের জন্য ইসলামী শরীয়ত দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাহারা বসিয়েছে। মেয়েদের জন্য পর্দা অপরিহার্য করা হয়েছে। পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অলংকারের শব্দ ও নারী কণ্ঠের গানের শব্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, এটা নির্লজ্জ কাজে উৎসাহ যোগায়। সাথে সাথে যার মধ্যে এসব ব্যাপারে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাকে একান্তে বোঝাবার আদেশ আছে; কিন্তু লাঞ্ছিত করার অনুমতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি শরীয়ত আরোপিত সাবধানতাসমূহ ডিঙিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তার অপরাধ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, তদবস্থায় তার অপরাধ গোপন রাখা অন্যদের সাহস বাড়ানোর কারণ হতে পারে। তাই এ পর্যন্ত অপরাধ

গোপন রাখার জন্য শরীয়ত যতটুকু যত্নবান ছিল, এমন অপরাধীকে জনসমক্ষে হেয় ও লাঞ্ছিত করার জন্যও ততটুকুই যত্নবান। এ কারণেই ব্যভিচারের শাস্তি শুধু প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি ; বরং মুসলমানদের একটি দলকে তাতে উপস্থিত থাকার ও অংশগ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۚ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣

(৩) ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মু'মিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ব্যভিচার এমন নোংরা কাজ যে, এতে মানুষের মেজাযই বিগড়ে যায়। তার আগ্রহ মন্দ বিষয়াদির প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। এমন বদ লোকের প্রতি আগ্রহ তার মতই আরেকজন চরিত্রভ্রষ্ট বদ লোকেরই হতে পারে। সেমতে) ব্যভিচারী পুরুষ (ব্যভিচারী ও ব্যভিচারের প্রতি অগ্রহী হওয়ার দিক থেকে) কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং (এমনিভাবে) ব্যভিচারিণীকেও (ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারের প্রতি আগ্রহী হওয়ার দিক থেকে) ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে করে না। এবং এটা (অর্থাৎ ব্যভিচারিণীর যে বিবাহ ব্যভিচারিণী হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়, যার ফলস্বরূপ সে ভবিষ্যতেও ব্যভিচারিণী থাকবে অথবা যে বিবাহ কোন মুশরিকা নারীর সাথে হয়) মুসলমানদের ওপর হারাম (এবং গোনাহ্‌র কারণ) করা হয়েছে (যদিও শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতায় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যভিচারিণীকে কেউ বিয়ে করলে গোনাহ্ হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে শুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে মুশরিকা নারীকে বিয়ে করলে গোনাহ্ তো হবেই, বিয়েও শুদ্ধ হবে না ; বরং বাতিল হবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্যভিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধান ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত প্রথম বিধান ছিল ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত। এই দ্বিতীয় বিধান ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারীর সাথে বিবাহেরও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তফসীর সম্পর্কে

তফসীরকারদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। তন্মধ্যে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত তফসীরই অধিক সহজ ও নির্ভেজাল মনে হয়। এর সারমর্ম এই যে, আয়াতের সূচনাভাগে শরীয়তের কোন বিধান নয়, বরং একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যভিচার একটি অপকর্ম এবং এর অনিষ্টতা সুদূর-প্রসারী। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ব্যভিচার একটি চারিত্রিক বিষ। এর বিষাক্ত প্রভাবে মানুষ চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে যায়। ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায় এবং দুশ্চরিত্রতাই কাম্য হয়ে যায়। হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। এরূপ চরিত্রভ্রষ্ট লোক ব্যভিচার ও ব্যভিচারে সম্মত করার উদ্দেশ্যেই কোন নারীকে পছন্দ করে। ব্যভিচারের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে অপারক অবস্থায় বিবাহ করতে সম্মত হয়; কিন্তু সে মনেপ্রাণে বিবাহকে পছন্দ করে না। কেননা, বিবাহের লক্ষ্য হচ্ছে সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপন করা এবং সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি জন্ম দেওয়া। এর জন্য স্ত্রীর আজীবন ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ও অন্যান্য অধিকার মেনে নিতে হয়। চরিত্রভ্রষ্ট লোক এসব দায়িত্ব পালনকে সাক্ষাৎ বিপদ মনে করে। যেহেতু বিবাহ ঐ ধরনের লোকের উদ্দেশ্যই থাকে না, তাই তাদের আগ্রহ শুধু মুসলমান নারীদের প্রতিই নয়; বরং মুশরিকা নারীদের প্রতিও থাকে। মুশরিকা নারী যদি তার ধর্মের খাতিরে কিংবা কোন সামাজিক প্রথার কারণে বিবাহের শর্ত আরোপ করে, তবে বাধ্য হয়ে তাকে বিবাহ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। এ বিবাহ হালাল ও শুদ্ধ কিনা অথবা শরীয়ত মতে বাতিল হবে কিনা, সেদিকে তারা বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ করে না। কাজেই এরূপ চরিত্রভ্রষ্ট লোকদের বেলায় এ-কথা সত্য যে, তারা যে নারীকে পছন্দ করবে, সে মুসলমান হলে ব্যভিচারিণী হবে---পূর্ব থেকে ব্যভিচারে অভ্যস্ত হোক কিংবা তাদের সাথে ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারিণী কথিত হোক। অথবা তারা কোন মুশরিকা নারীকে পছন্দ করবে, যাকে বিবাহ করাই ব্যভিচারের নামান্তর। এ হচ্ছে আয়াতের প্রথম বাক্যের অর্থ; অর্থাৎ اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً—

এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যস্ত এবং তওবা করে না, তার প্রতি কোন সত্যিকার মু'মিন মুসলমানের আগ্রহ থাকতে পারে না। কারণ, মু'মিন মুসলমানের আসল লক্ষ্য হল বিবাহ এবং বিবাহের শরীয়তসম্মত উপকারিতা ও লক্ষ্য অর্জন। এরূপ নারী দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জন আশা করা যায় না; বিশেষত যখন এ কথাও জানা থাকে যে, এই নারী বিবাহের পরও ব্যভিচারের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করবে না। হ্যাঁ, এরূপ নারীকে কোন ব্যভিচারীই পছন্দ করবে, যার আসল লক্ষ্য কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা—বিবাহ উদ্দেশ্য নয়। যদি এই ব্যভিচারিণী নারী কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে তার সাথে মিলনের জন্য বিবাহের শর্ত আরোপ করে; তবে অনিচ্ছা সহকারে বিবাহেও সম্মত হয়ে যায়। অথবা এরূপ নারীকে বিবাহ করতে কোন মুশরিক সম্মত হবে। যেহেতু মুশরিকের সাথে বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচারের নামান্তর, তাই এতে দুটি বিষয়ের সমাবেশ হবে অর্থাৎ সে মুশরিকও এবং ব্যভিচারীও। এ হচ্ছে আয়াতের

দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ ; অর্থাৎ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

উল্লিখিত তফসীর থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বলে এমন পুরুষ ও নারীকে বোঝানো হয়েছে, যারা তওবা করে না এবং বদভ্যাসে অটল থাকে। যদি তাদের মধ্যে কোন পুরুষ ঘর-সংসার কিংবা সন্তান-সন্ততি লাভের উদ্দেশ্যে কোন সতী-সাধ্বী নারীকে বিবাহ করে কিংবা কোন ব্যভিচারিণী নারী কোন সৎ পুরুষকে বিবাহ করে, তবে আয়াত দ্বারা এরূপ বিবাহের অশুদ্ধতা বোঝা যায় না। শরীয়ত মতে এরূপ বিবাহ শুদ্ধ হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা, মালিক, শাফেঈ প্রমুখ বিশিষ্ট ফিকাহ্‌বিদের মযহাব তাই। সাহাবায়ে কিরাম থেকে এরূপ বিবাহ ঘটানোর ঘটনাবলী প্রমাণিত আছে। তফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরূপ ফতোয়াই বর্ণিত আছে। وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ আয়াতের এই শেষ বাক্যে কোন কোন তফসীরকারকের মতে ذَٰلِكَ বলে যিনা তথা ব্যভিচারের দিকে ইশারা করা হয়েছে। বাক্যের অর্থ এই যে, ব্যভিচার যেহেতু অপকর্ম, তাই মু'মিনদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। এই তফসীরে অর্থের দিক দিয়ে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ذٰلِكَ শব্দ দ্বারা ব্যভিচার বোঝানো আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে অবশ্যই সঙ্গতিহীন। তাই অন্যান্য তফসীরকারক বলেন যে, ذٰلِكَ দ্বারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহ এবং মুশরিক ও মুশরিকার বিবাহের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুশরিক পুরুষের সাথে মুসলমান নারীর বিবাহ এবং মুশরিকা নারীর সাথে মুসলমান পুরুষের বিবাহ যে হারাম, তা তো কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় একমত। এছাড়া ব্যভিচারী পুরুষের সাথে সতী নারীর বিবাহ অথবা ব্যভিচারিণী নারীর সাথে সৎ পুরুষের বিবাহ অবৈধ বলেও এ বাক্য থেকে জানা যায়। এই অবৈধতা বিশেষভাবে তখন হবে, যখন সৎ পুরুষ ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করে তাকে ব্যভিচারে বাধা না দেয়; বরং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে। কেননা, এমতাবস্থায় এটা হবে দায়্যুসী (ভেড়ুয়াপনা) যা শরীয়তে হারাম। এমনিভাবে কোন সম্ভ্রান্ত সতী নারী যদি কোন ব্যভিচারে অভ্যস্ত পুরুষকে বিবাহ করে এবং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে, তবে তা হারাম ও কবীরা গোনাহ্। কিন্তু এতে তাদের পারস্পরিক বিবাহ অশুদ্ধ কিংবা বাতিল হওয়া জরুরী নয়। শরীয়তের পরিভাষায় 'হারাম' শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়—এক. কাজটি গোনাহ্। যে তা করে সে পরকালে শাস্তিযোগ্য এবং ইহকালেও বাতিল বলে গণ্য। কোন পার্থিব বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য নয়; যেমন কোন মুশরিকা নারীকে অথবা চিরতরে হারাম এমন নারীকে বিবাহ করা। এরূপ বিবাহ কবীরা গোনাহ্ এবং শরীয়তে অস্তিত্বহীন। ব্যভিচার ও এর

মধ্যে কোন তফাৎ নেই। দুই. কাজটি হারাম অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য গোনাহ্; কিন্তু দুনিয়াতে কাজটির কিছু ফল প্রকাশ পায় ও শুদ্ধ হয়; যেমন কোন নারীকে ধোঁকা দিয়ে অথবা অপহরণ করে এমন শরীয়তানুযায়ী দুইজন সাক্ষীর সামনে তার সম্মতিক্রমে বিবাহ করা। এখানে কাজটি অবৈধ ও গোনাহ্ হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং সন্তানরা পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে এবং কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে বিবাহ করেও ব্যভিচার থেকে তওবা না করে, তবে তাদের এই বিবাহ হারাম; কিন্তু পার্থিব বিধানে বাতিল ও অস্তিত্বহীন নয়। বিবাহের শরীয়তারোপিত ফলাফল—যেমন ভরণপোষণ, মোহরানা, উত্তরাধিকার স্বত্ব ইত্যাদি সব তাদের ওপর প্রযোজ্য হবে। এভাবে حُرِّمَ শব্দটি আয়াতে মুশরিকা নারীর ক্ষেত্রে প্রথম অর্থে এবং ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থে বিশুদ্ধ ও সঠিক। কোন কোন তফসীরকারক আয়াতটিকে মনসূখ তথা রহিত বলেন; কিন্তু বর্ণিত তফসীর অনুযায়ী আয়াতটিকে মনসূখ বলার প্রয়োজন নেই।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۙ﴿٤﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥﴾

(৪) যারা সতী সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই না'ফরমান। (৫) কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যারা সতী সাধ্বী নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, (যাদের ব্যভিচারিণী হওয়া কোন প্রমাণ অথবা শরীয়তসম্মত ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত নয়) অতঃপর (দাবীর স্বপক্ষে) চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও কবুল করবে না (এটাও অপবাদ আরোপের শাস্তির অংশ। তাদের সাক্ষ্য চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হবে। এ হচ্ছে দুনিয়ার শাস্তি।) এবং এরা (পরকালেও শাস্তির যোগ্য। কেননা তারা) পাপাচারী। কিন্তু যারা এরপর (আল্লাহ্র কাছে) তওবা করে (কেননা, অপবাদ আরোপ করে তারা আল্লাহ্র নাফরমানী করেছে এবং আল্লাহ্র হক নষ্ট করেছে) এবং (যার প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে, তার দ্বারা ক্ষমা করিয়েও) নিজের (অবস্থার) সংশোধন করে;

(কেননা, তারা তার হক নষ্ট করেছিল) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (অর্থাৎ খাঁটি তওবা করলে পরকালের আযাব মাফ হয়ে যাবে; যদিও জাগতিক শাস্তি অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া বহাল থাকবে। কেননা, এটা শরীয়তের হদের অংশ এবং অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তওবা করলে হদ মওকুফ হয় না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্যভিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান; মিথ্যা অপবাদ একটি অপরাধ এবং তার হদ ঃ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যভিচার অন্যান্য অপরাধের তুলনায় সমাজকে অধিক নষ্ট ও কলুষিত করে। তাই শরীয়ত এর শাস্তি সব অপরাধের চাইতে বেশি কঠোর রেখেছে। এক্ষণে কেউ যাতে কোন পুরুষ অথবা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস না করে, সেজন্য ব্যভিচার প্রমাণ করার বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবী। শরীয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য চারজন আদেল পুরুষের সাক্ষ্য জরুরী। এই প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারও প্রতি প্রকাশ্য ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরীয়ত এই অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর অপবাদ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, কোন ব্যক্তি কারও প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস তখনই করবে, যখন সে নিজ চোখে এই অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখবে এবং শুধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করবে যে, তার সাথে আরও তিনজন পুরুষ এ অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। কেননা, যদি অন্য সাক্ষী না-ই থাকে কিংবা চারজনের চাইতে কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তবে একা এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে অপবাদ আরোপের শাস্তির ঝুঁকি নেওয়া কোন অবস্থাতেই পছন্দ করবে না।

একটি সন্দেহ ও জওয়াব ঃ এখানে কেউ বলতে পারে যে, ব্যভিচারের সাক্ষ্য-দানের ক্ষেত্রে এত কড়া শর্ত আরোপ করার ফলে অপরাধীরা নাগালের বাইরে চলে যাবে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের দুঃসাহস করবে না এবং কোন সময় শরী-য়তসম্মত প্রমাণ উপস্থিত হবে না। ফলে এ ধরনের অপরাধী কখনও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না। কিন্তু বাস্তবে এই ধারণা ভ্রান্ত। কেননা, এসব শর্ত হচ্ছে ব্যভিচারের হদ অর্থাৎ একশ বেত্রাঘাত অথবা রজমের শাস্তি দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুইজন গায়র মাহরাম পুরুষ ও নারীকে একত্রে আপত্তিকর অবস্থায় অথবা নির্লজ্জ কথাবার্তা বলা অবস্থায় দেখে এ-ধরনের সাক্ষ্যদানের ওপর কোন শর্ত আরোপিত নেই। এ-ধরনের যেসব বিষয় ব্যভিচারের ভূমিকা, সেগুলোও শরীয়তের আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে এ ক্ষেত্রে হদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না; বরং বিচারক অথবা শাসনকর্তার বিবেচনা অনুযায়ী বেত্রাঘাতের শাস্তি দেওয়া হবে। কাজেই যে ব্যক্তি দুইজন পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখবে, অন্য সাক্ষী না থাকলে সে প্রকাশ্য ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেবে না; কিন্তু অবাধ মেলামেশার সাক্ষ্য দিতে পারবে এবং বিচারক অপরাধ প্রমাণিত হলে তাদেরকে দণ্ডমূলক শাস্তি দিতে পারবে।

মুহ্‌সিনাত কারা? محصنات শব্দটি احصان থেকে উদ্ভূত। শরীয়তের পরিভাষায় احصان দুই প্রকার। একটি ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও অপরটি অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য احصان এই যে, যার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং শরীয়তসম্মত পন্থায় কোন নারীকে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গমও হতে হবে। এরূপ ব্যক্তির প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য احصان এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং সৎ হতে হবে অর্থাৎ পূর্বে কখনও তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়নি। আলোচ্য আয়াতে মুহসিনাতের অর্থ তাই।---(জাস্‌সাস)

মাস'আলা ঃ কোরআনের আয়াতে সাধারণ রীতি অনুযায়ী কিংবা শানে নুযূলের ঘটনার কারণে অপবাদের শাস্তি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদিকে আছে অপবাদ আরোপকারী পুরুষ ও অপরদিকে যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, সেই সতী-সাধ্বী নারী। কিন্তু শরীয়তের বিধান কারণের অভিন্নতাবশত ব্যাপক; কোন নারী অন্য নারীর প্রতি অথবা কোন পুরুষের প্রতি কিংবা কোন পুরুষ অন্য পুরুষের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলে এবং প্রমাণ উপস্থিত না করলে সবাই এই শাস্তির যোগ্য বলে গণ্য হবে।---(জাস্‌সাস, হিদায়া)

o ব্যভিচারের অপবাদ প্রসঙ্গে উল্লেখিত এই শাস্তি শুধু এই অপবাদের জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কোন অপরাধের অপবাদ আরোপ করা হলে এই শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। তবে বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী প্রত্যেক অপরাধের অপবাদের জন্য দণ্ডমূলক শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। কোরআনের ভাষায় যদিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, এই হদ ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে; কিন্তু চারজন পুরুষের সাক্ষ্যের কথা বলা এই সীমাবদ্ধতার প্রমাণ। কেননা, চারজন সাক্ষীর শর্ত শুধু ব্যভিচার প্রমাণের জন্যই নির্দিষ্ট।---(জাস্‌সাস, হিদায়া)

o অপবাদের হদে বান্দার হক অর্থাৎ যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়, তার হকও শামিল রয়েছে। তাই এই হদ তখনই কার্যকর করা হবে, যখন প্রতিপক্ষ অর্থাৎ যার প্রতি আরোপ করা হয়, সে হদ কার্যকর করার দাবীও করে। নতুবা হদ জারি করা হবে না ---(হিদায়া), ব্যভিচারের হদ এরূপ নয়। এটা খাঁটি আল্লাহ্‌র হক। কাজেই কেউ দাবী করুক বা না করুক, হদ কার্যকর হবে।

و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا ---অর্থাৎ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষের দাবীর কারণে হদ কার্যকর হয়, তার একটি শাস্তি তো তাৎক্ষণিক বাস্তবায়িত হয়ে গেছে; তাকে আশিটি

বেত্রাঘাত করা হয়েছে; দ্বিতীয় শাস্তি চিরকাল জারি থাকবে। তা এই যে, কোন মুকদ্দমায় তার সাক্ষ্য কবূল করা হবে না, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তওবা পূর্ণ না করে। এরূপ তওবা করলেও হানাফী আলিমগণের মতে তার সাক্ষ্য কবূল করা হয় না। হ্যাঁ, তবে গোনাহ মাফ হয়ে যায়; যেমন তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে ঃ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

---অর্থাৎ যাদের ওপর অপবাদের হদ কার্যকর করা হয়েছে, তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের অবস্থা শোধরায়, অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি দ্বারাও ক্ষমা করিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়ালু।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا বাক্যের এই ব্যতিক্রম ইমাম আবূ হানীফা ও অন্য কয়েক জন ইমামের মতে পূর্ববর্তী আয়াতের শুধু শেষ বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে; অর্থাৎ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ---অতএব এই ব্যতিক্রমের উদ্দেশ্য এই যে, যার ওপর অপবাদের হদ জারি করা হয়, সে ফাসেক; কিন্তু যদি সে খাঁটি মনে তওবা করে এবং উল্লিখিতভাবে নিজের অবস্থা শোধরায়, তবে সে ফাসেক থাকবে না এবং তার পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। এর ফলশ্রুতি এই যে, আয়াতের শুরুতে দুনিয়ার যে দু'টি শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত করা ও সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া---এ শাস্তিদ্বয় তওবা সত্ত্বেও স্বস্থানে বহাল থাকবে। কেননা, প্রথম বড় শাস্তিটি তো কার্যকর হয়েই গেছে। দ্বিতীয় শাস্তিটিও হদেরই অংশবিশেষ। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, তওবা দ্বারা হদ মাফ হয় না; যদিও পরকালীন আযাব মাফ হয়ে যায়। অতএব দ্বিতীয় শাস্তি সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া তওবা দ্বারা মাফ হবে না। ইমাম শাফেঈ ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে উল্লেখিত ব্যতিক্রম পূর্ববর্তী আয়াতের সব বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। এর অর্থ হবে এই যে, তওবা করার ফলে যেমন সে ফাসেক থাকবে না, তেমনি তার সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যাত হবে না। জাস্সাস ও মাযহারীতে উভয় পক্ষের প্রমাণাদি ও জওয়াব বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন। والله اعلم

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ
لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ

أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ ۙ إِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ
غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهٗ وَأَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۝

এবং (৬) যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য ঐভাবে হবে যে, সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী; (৭) এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহ্‌র লানত। (৮) এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী; (৯) এবং পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহ্‌র গযব নেমে আসবে। (১০) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী, প্রজ্ঞাময় না হলে কত কিছুই যে হয়ে যেত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া (অর্থাৎ নিজেদের দাবী ছাড়া) তাদের আর কোন সাক্ষী নেই; এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য (যাতে আটকাদেশ অথবা অপবাদের হদ দূর হয়ে যায়) ঐভাবে হবে যে, সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চারবার বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, তার ওপর আল্লাহ্‌র লানত হবে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়। (এরপর) স্ত্রীর শাস্তি (অর্থাৎ আটক থাকা অথবা ব্যভিচারের হদ) রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চারবার বলে যে, এই পুরুষ অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, তার ওপর আল্লাহ্‌র গযব নেমে আসবে যদি এই পুরুষ সত্যবাদী হয় (এভাবে উভয় স্বামী-স্ত্রী পার্থিব শাস্তির কবল থেকে বাঁচতে পারবে। তবে স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে)। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত (যে কারণে মানুষের স্বভাবগত প্রবণতার প্রতি পুরাপুরি লক্ষ্য রেখে বিধানাবলী প্রদান করেছেন) এবং আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী ও প্রজ্ঞাময় না হতেন, তবে তোমরা সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে (যেগুলো পরে বর্ণনা করা হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্যভিচার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধান লেয়ান ঃ لعان ও ملاعنت শব্দের অর্থ একে অপরের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধের বদদোয়া করা। শরীয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ কয়েকটি শপথ দেয়াকে লেয়ান বলা হয়। যখন কোন স্বামী

তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার শুক্রজাত নয়, অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবী করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চারজন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লেয়ান করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে কোরআনে উল্লেখিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হবে।

স্বামী যদি এসব কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরোক্ত ভাষায় পাঁচবার কসম না খায়, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার ওপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাঁচবার কসম খেয়ে নেয়, তবে স্ত্রীর কাছ থেকে কোরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচবার কসম নেয়া হবে। যদি সে কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে যে পর্যন্ত স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার ওপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত ভাষায় কসম খেতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম খেয়ে নেয়, তবে লেয়ান পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে পার্থিব শাস্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে। পরকালের ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী পরকালে শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে লেয়ান হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামীর উচিত হবে তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেওয়া। সে তালাক না দিলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। এটা তালাকেরই অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবে না। লেয়ানের এই বিবরণ ফিকাহ্ গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত আছে।

ইসলামী শরীয়তে লেয়ানের আইন স্বামীর মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত কোন ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা জরুরী যে, অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী পেশ করবে। যদি তা করতে না পারে, তবে উল্টা তার ওপরই ব্যভিচারের অপবাদের হদ জারি করা হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এটা সম্ভবপর যে, যখন চারজন সাক্ষী পাওয়া দুষ্কর হয়, তখন ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন না করে চুপ মেরে থাকবে, যাতে অপবাদের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকে; কিন্তু স্বামীর পক্ষে ব্যাপারটি খুবই নাজুক। সে যখন স্বচক্ষে

দেখবে অথচ সাক্ষী নেই, তখন যদি সে মুখ খোলে, তবে অপবাদ আরোপের শাস্তি ভোগ করবে আর যদি মুখ না খোলে, তবে আজীবন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং জীবন-ধারণও দুর্বিষহ হয়ে পড়বে। এ কারণে স্বামীর ব্যাপারটিকে সাধারণ আইনের আওতা-বহির্ভূত করে স্বতন্ত্র আইনের রূপ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে আরও জানা গেল যে, লেয়ান শুধু স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে হতে পারে। অন্যদের বিধান পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিধানের অনুরূপ। হাদীসের কিতাবাদিতে এ স্থলে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে লেয়ান আয়াতের শানে নুযূল কোন্ ঘটনাটি, এ সম্পর্কে তফসীর-কারদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কুরতুবী আয়াতের অবতরণ দু'বার ধরে উভয় ঘটনাকে শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন। বুখারীর টীকাকার হাফেয ইবনে হজর এবং মুসলিমের টীকাকার ইমাম নবভী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একই অবতরণের মধ্যে উভয় ঘটনাকে শানে নুযূল আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য অধিক স্পষ্ট, যা পরে বর্ণিত হবে। একটি ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়া ও তার স্ত্রীর, যা সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাসের জবানী বর্ণিত আছে। এই ঘটনার প্রাথমিক অংশ ইবনে আব্বাসেরই জবানী মসনদে আহ্মদে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ যখন কোরআনে অপবাদের হদ সম্পর্কিত

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ, এতে কোন নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী পুরুষের জন্য জরুরী করা হয়েছে যে, হয় সে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করবে, তন্মধ্যে একজন সে নিজে হবে, না হয় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। এই আয়াত শুনে আনসারদের সরদার হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আয়াতগুলো কি ঠিক এভাবেই নাযিল হয়েছে? রসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ ইবনে উবাদার মুখে এরূপ কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি আনসারগণকে সম্বোধন করে বললেনঃ তোমরা কি শুনলে, তোমাদের সরদার কি কথা বলছেন? আনসারগণ বললঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনি তাকে তিরস্কার করবেন না। তাঁর এ কথা বলার কারণ তাঁর তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ। অতঃপর সা'দ ইবনে উবাদা নিজেই আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ; আমার পুরাপুরি বিশ্বাস যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি আশ্চর্য বোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার ওপর ভিন্ন পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্য বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শাসাই এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই; না আমার জন্য এটা জরুরী যে, আমি

চারজন লোক এনে অবস্থা দেখাই এবং সাক্ষী করি? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ করব, ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে না? এ স্থলে হযরত সা'দের ভাষা বিভিন্ন রূপ বর্ণিত আছে। সবগুলোর সারমর্ম একই।---(কুরতুবী)

অপবাদের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত অবতরণ ও সা'দ ইবনে মুয়াযের এই কথা-বার্তার অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হল। হিলাল ইবনে উমাইয়া এশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে শুনলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রসূলুল্লাহ্ (স)-র কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করলেন। এদিকে আনসারগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সরদার সা'দ যে কথা বলেছিলেন, এক্ষণে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এখন শরীয়তের আইন অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা) হিলাল ইবনে উমাইয়াকে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হিলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেনঃ আল্লাহ্র কসম, আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। বুখারীর রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে, যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) হিলালের ব্যাপার শুনে কোরআনের বিধান মোতাবেক তাকে বলেও দিয়েছিলন যে, হয় দাবির স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তিস্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। হিলাল উত্তরে আরয করলেনঃ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই এমন কোন বিধান নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। এই কথাবার্তা চলছিল, এমতা-বস্থায় জিবরাঈল লেয়ানের আইন সম্বলিত আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন; অর্থাৎ

—وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ الآية

আবূ ইয়ালা এই রেওয়ায়েতটিই হযরত আনাস (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) হিলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সমস্যার সমাধান নাযিল করেছেন। হিলাল আরয করলেনঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই আশাই পোষণ করছিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) হিলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেয়া হল। সে বললঃ আমার স্বামী হিলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন! রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে তওবা করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবে? হিলাল আরয করলেনঃ আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছি। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াত অনুযায়ী উভয়কে

লেয়ান করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হিলালকে বলা হয় যে, তুমি কোরআনে বর্ণিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্য দাও; অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌কে হাযির ও নাযির বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হিলাল আদেশ অনুযায়ী চারবার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যের কোরআনী ভাষা এরূপ ঃ যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হবে। এই সাক্ষ্যের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) হিলালকে বললেন ঃ দেখ হিলাল, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা, দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় অনেক হাল্কা। আল্লাহ্‌র আযাব মানুষের দেয়া শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। কিন্তু হিলাল আরয করলেন ঃ আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই সাক্ষ্যের কারণে পরকালের আযাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যের শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হিলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরনের চার সাক্ষ্য অথবা কসম নেওয়া হল। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ একটু থাম। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এই সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। আল্লাহ্‌র আযাব মানুষের আযাব অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর। একথা শুনে সে কসম খেতে ইতস্তত করতে লাগল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করব না। অতঃপর সে সাক্ষ্যও এ কথা বলে দিয়ে দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার ওপর আল্লাহ্‌র গযব হবে। এভাবে লেয়ানের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সা) উভয় স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্থাৎ তাদের বিবাহ নাকচ করে দিলেন। তিনি আরও ফয়সালা দিলেন যে, এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্ম-গ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে---পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কিন্তু সন্তানটিকে ধিকৃতও করা হবে না। ---(মাযহারী)

দ্বিতীয় ঘটনাও বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। ঘটনার বিবরণ ইমাম বগভী ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ অপরাদের শাস্তি সম্বলিত আয়াত নাযিল হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে তা মুসলমানদেরকে শুনিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আসেম ইবনে আদী আনসারীও ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীকে কোন পুরুষের সাথে লিপ্ত দেখে, তবে দেখা ঘটনা বর্ণনা করার কারণে তাকে আশিটি কশাঘাত করা হবে, চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে এবং মুসলমানগণ তাকে ফাসেক বলবে। এমতাবস্থায় আমরা সাক্ষী কোথা থেকে আনব? সাক্ষীর খোঁজে বের হলে সাক্ষী আসা পর্যন্ত তারা কার্যসিদ্ধি করে পলায়ন করবে। এটা হুবহু প্রথম ঘটনায় সা'দ ইবনে মুয়াযের উত্থাপিত প্রশ্ন।

এক শুক্রবারে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এরপর একটি ঘটনা ঘটল। আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ওয়ায়মেরের বিবাহ আসেম ইবনে আদীর চাচাত বোন খাওলার সাথে হয়েছিল। ওয়ায়মের একদিন তার স্ত্রীকে শরীক ইবনে সাহমার সাথে লিপ্ত দেখতে পেলেন। শরীকও আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ছিল। ওয়ায়মের

আসেমের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। আসেম ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি পাঠ করলেন এবং পরবর্তী দিন জুম'আর নামাযের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, বিগত জুম'আয় আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম পরিতাপের বিষয় যে, আমি নিজেই এতে জড়িত হয়ে পড়েছি। কেননা, আমার পরিবারের মধ্যেই এরূপ ঘটনা ঘটে গেছে। ইমাম বগভী উভয়কে উপস্থিত করা এবং তাদের মধ্যে লেয়ান করানোর ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।---(মাযহারী) বুখারী ও মুসলিমে সাহল ইবনে সা'দ সায়েদীর রেওয়ায়েতে এর সার-সংক্ষেপ এভাবে বর্ণিত আছে যে, ওয়ায়মের আজলানী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ভিন্ন পুরুষকে দেখে, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে? নতুবা সে কি করবে? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে বিধান নাযিল করেছেন। যাও, স্ত্রীকে নিয়ে এস। বর্ণনাকারী সাহল বলেন ঃ তাদেরকে এনে রসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদের মধ্যে লেয়ান করালেন। যখন উভয় পক্ষ থেকে পাঁচটি সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লেয়ান সমাপ্ত হল, তখন ওয়ায়মের বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, এখন যদি আমি তাকে স্ত্রীরূপে রাখি, তবে এর অর্থ এই যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি। তাই আমি তাকে তিন তালাক দিলাম।---(মাযহারী)

উপরোক্ত ঘটনাদ্বয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হাকেম ইবনে হজর ও ইমাম নবভী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লেয়ান-আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ওয়ায়মের এমনি ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পেশ করা হল, তখন তিনি বললেন। তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই যে, হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় হাদীসের ভাষা হচ্ছে فنزل جبرئيل এবং ওয়ায়মেরের ঘটনায় ভাষা হচ্ছে قد انزل الله فيك এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অনুরূপ এক ঘটনায় এর বিধান নাযিল করেছেন।---(মাযহারী) والله اعلم

মাস'আলা ঃ বিচারকের সামনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেয়ান হয়ে গেলে স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায়; যেমন দুগ্ধ পান করানোর ফলেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন চিরতরে অবৈধ হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ المتلاعنان لا يجتمعان ابدا লেয়ানের সাথে-সাথেই স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়; কিন্তু ইদ্দতের পর স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে চাইলে ইমাম আযমের মতে তা তখনই জায়েয হবে, যখন স্বামী তাকে তালাক দেয় কিংবা মুখে বলে দেয় যে, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। স্বামী এরূপ না করলে বিচারক তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ জারি

করবেন এবং তাও তালাকের অনুরূপ হবে। এরপর তিন হায়েয অতিবাহিত হলে স্ত্রী অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে।---(মাযহারী)

মাস'আলা ঃ লেয়ানের পর এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে স্বামীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না; তাকে তার মাতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) হিলাল ইবনে উমাইয়া ও ওয়ায়মের আজলানী উভয়েরই ঘটনায় এই ফয়সালা দিয়েছিলেন।

লেয়ানের পর যে মিথ্যাবাদী, তার পরকালীন আযাব আরও বেড়ে যাবে; কিন্তু দুনিয়ার শাস্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে। এমনিভাবে তাকে দুনিয়াতে ব্যভিচারিণী ও সন্তানকে জারজ সন্তান বলাও কারও জন্য জায়েয হবে না। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা) ফয়সালায় একথাও বলেছিলেন। وقضى بان لا ترمى ولا ولدها

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ
كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ لَّوْلَا جَاءُو
عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ
هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ
تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِندَ
اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ
بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ
أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝١٩ وَلَوْلَا فَضْلُ
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝٢٠ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ
بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ
مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝٢١ وَلَا يَاْتَلِ
اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ
وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۭ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ
اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٢٢ اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ
الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۠ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝٢٣ يَّوْمَ تَشْهَدُ
عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٢٤ يَوْمَئِذٍ
يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۝٢٥
اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ
وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ۭ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ
وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٢٦

(১১) যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না ; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু আছে, যতটুকু সে গোনাহ্ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। (১২) তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ? (১৩) তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে নি ; অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করে নি, তখন তারাই আল্লাহ্র কাছে মিথ্যাবাদী। (১৪) যদি ইহকালে ও পরকালে

তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা করেছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত। (১৫) যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহ্‌র কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল। (১৬) তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ্ তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। (১৭) আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। (১৮) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৯) যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। (২০) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত এবং আল্লাহ্ দয়ালু, মেহেরবান না হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে যেত। (২১) হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, জানেন। (২২) তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (২৩) যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ, ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিক্কৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি। (২৪) যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত; (২৫) সেদিন আল্লাহ্ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরাপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহ্‌ই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী। (২৬) দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য। তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-নূরের অধিকাংশ আয়াত সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য প্রবর্তিত বিধানাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর বিপরীতে সতীত্ব ও পবিত্রতার ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শাস্তি ও পারলৌকিক মহাবিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এই পরম্পরায় প্রথমে ব্যভিচারের হদ, অতঃপর অপবাদের হদ ও পরে লেয়ানের কথা বর্ণিত হয়েছে। অপবাদের

হদ প্রসঙ্গে চারজন সাক্ষীর অবর্তমানে কোন সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরূপ অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রবর্তন করা হয়েছে। এই বিষয়টি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ষষ্ঠ হিজরীতে কতিপয় মুনাফিক উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র প্রতি এমনি ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলমানও এ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের ব্যাপার থেকে অত্যধিক গুরুতর ছিল। তাই কোরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আয়েশার পবিত্রতা ও সতীত্ব বর্ণনা করে এ স্থলে উপরোক্ত দশটি আয়াত নাযিল করেছেন। এ সব আয়াতে হযরত আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা করে তাঁর ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সবাইকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কোরআন ও হাদীসে 'ইফ্কের ঘটনা' নামে খ্যাত। 'ইফ্ক' শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। এসব আয়াতের তফসীর বোঝার জন্য অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। তাই প্রথমে সংক্ষেপ কাহিনীটি বর্ণনা করা হচ্ছে।

মিথ্যা অপবাদের কাহিনী ঃ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ হিজরীতে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরাইসী যুদ্ধে গমন করেন, তখন বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশার উটের পিঠে পর্দা-বিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা প্রথমে পর্দা বিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করার পর শেষ রাত্রে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হল যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হোক। হযরত আয়েশার পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল ; তিনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিঁড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। তিনি হার তালাশ করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশার পর্দা বিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দেওয়া হল এবং বাহকরা মনে করল যে, তিনি ভেতরেই আছেন। ওঠানোর সময়ও সন্দেহ হল না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা ক্ষীণাঙ্গিণী ছিলেন। ফলে আসনটি শূন্য---এরূপ ধারণাও কারও মনে উদয় হল না। হযরত আয়েশা ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং

কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা ও এদিক-ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে গেলেন। তিনি মনে করলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তদীয় সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে, আমি আসনে অনুপস্থিত, তখন আমার খোঁজে তাঁরা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গেলে তাদের জন্য তালাশ করে নেওয়া কঠিন হবে। তাই তিনি স্বস্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় ছিল শেষরাত্রি। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

অপরদিকে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালকে রসূলুল্লাহ্ (সা) এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌঁছলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে হযরত আয়েশাকে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দাপ্রথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত পরিতাপের সাথে তাঁর মুখ থেকে "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" উচ্চারিত হয়ে গেল। এই বাক্য হযরত আয়েশার কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। হযরত সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের নাকে রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিত্র, মুনাফিক ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শত্রু। সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও কান কথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে ওঠল। পুরুষদের মধ্যে হযরত হাসসান, মিস্তাহ্ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ্ ছিল-এ শ্রেণীভুক্ত। তফসীরে দুররে মনসূরে ইবনে মরদুওয়াইহর বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তিই বর্ণিত আছে যে, اعانه اى عبد الله بن ابى حسان و مسطح و حمنة

যখন এই মুনাফিক-রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশার তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। এক মাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আয়েশার পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন। আয়াতগুলোর তফসীর পরে বর্ণিত হবে। অপবাদের হদে বর্ণিত কোরআনী বিধি অনুযায়ী অপবাদ আরোপ-কারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হল। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে? ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা) শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের অপবাদের হদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত করা হল। বাযযার ও ইবনে মরদুওয়াইহ্ হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তিনজন মুসলমান

মিসতাহ্, হামনাহ্ ও হাসসানের প্রতি হদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) আসল অপবাদ রচয়িতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের প্রতি দ্বিগুণ হদ প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুসলমানরা তওবা করে নেয় এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কায়েম থাকে।---(বয়ানুল কোরআন)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুসলমানগণ, তোমরা যারা হযরত আয়েশা সম্পর্কিত মিথ্যা অপবাদ খ্যাত হওয়ার কারণে দুঃখিত হয়েছ, হযরত আয়েশাও এর অন্তর্ভুক্ত, তোমরা অধিক দুঃখ করো না। কেননা) যারা এই মিথ্যা অপবাদ (হযরত আয়েশা সম্পর্কে) রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি (ক্ষুদ্র) দল। (কেননা অপবাদ আরোপকারী মোট চারজন ছিল; একজন সরাসরি এবং মিথ্যা অপবাদ রচয়িতা অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক এবং তিনজন পরোক্ষভাবে তার প্রচারণায় প্রভাবান্বিত হয়ে যায় অর্থাৎ, হাসসান, মিসতাহ্ ও হামনাহ্। এরা ছিল খাঁটি মুসলমান। কোরআন তাদের সবাইকে منكم বলে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছে; অথচ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছিল মুনাফিক। এর কারণ ছিল তার বাহ্যিক মুসলমানিত্বের দাবি। আয়াতের উদ্দেশ্য সান্ত্বনা দান করা যে, অধিক দুঃখ করো না। প্রথমত, সংবাদই মিথ্যা, এরপর বর্ণনাকারীও মাত্র চারজন। অধিকাংশ লোক তো এর বিপক্ষেই। কাজেই সাধারণভাবেও এটা অধিক চিন্তার কারণ হওয়া উচিত নয়। অতঃপর অন্য এক পন্থায় সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে ঃ) তোমরা একে (অর্থাৎ অপবাদ আরোপকে) নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না (যদিও বাহ্যত দুঃখজনক কথা; কিন্তু বাস্তবে এতে তোমাদের ক্ষতি নেই।) বরং এটা (পরিণামের দিক দিয়ে) তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। (কেননা, এই দুঃখের কারণে তোমরা সবরের সওয়াব পেয়েছ। তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিদের পবিত্রতা সম্পর্কে অকাট্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ভবিষ্যতেও মুসলমানদের জন্য এতে মঙ্গল আছে। কারণ, এরূপ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি এই ঘটনা থেকে সান্ত্বনা লাভ করবে। সুতরাং তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। তবে চর্চাকারীদের ক্ষতি হয়েছে যে,) তাদের মধ্যে যে যতটুকু করেছে, তার গোনাহ্ (উদাহরণত মুখে উচ্চারণকারীদের অধিক গোনাহ্ হয়েছে। যারা শুনে নিশ্চুপ রয়েছে কিংবা মনে মনে কুধারণা করেছে, তাদের তদনুযায়ী গোনাহ্ হয়েছে।) এবং তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে (অর্থাৎ অপবাদ রটনায়) যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে (অর্থাৎ একে আবিষ্কার করেছে। এখানে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিককে বোঝানো হয়েছে।) তার (সর্বাধিক) কঠোর শাস্তি হবে (অর্থাৎ জাহান্নামে যাবে। কুফর, কপটতা ও রসূলের প্রতি শত্রুতা পোষণের কারণে পূর্ব থেকেই সে এর যোগ্য ছিল। এখন সে আরও অধিক শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত বলা হল যে, দুঃখিতদের কোন ক্ষতি হয়নি বরং অপবাদ আরোপকারীদেরই ক্ষতি হয়েছে। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা খাঁটি মুসলমান ছিল তাদেরকে উপদেশমূলক তিরস্কার করা হচ্ছেঃ) যখন তোমরা এ-কথা শুনলে, তখন মুসলমান পুরুষ (হাসসান ও মিসতাহ্ও এর অন্তর্ভুক্ত)।

এবং মুসলমান নারীগণ (হামনাহ্ও এর অন্তর্ভুক্ত) কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে (অর্থাৎ হযরত আয়েশা ও সাফওয়ান সাহাবী সম্পর্কে মনেপ্রাণে) সুধারণা করেনি এবং (মুখে) বলেনি যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা। (দুররে মনসূরে আবূ আইউব ও তাঁর স্ত্রীর এরূপ উক্তিই বর্ণিত আছে। এতে অপবাদ আরোপকারীদের সাথে তারাও শামিল রয়েছে, যারা শুনে নিশ্চুপ ছিল কিংবা সন্দেহে পড়েছিল। সাধারণ ঈমানদার পুরুষ ও নারী সবাইকে তিরস্কার করা হয়েছে। অতঃপর এই অপবাদ খণ্ডন এবং সুধারণা রাখা যে ওয়াজিব, তার কারণ ব্যক্ত করা হচ্ছেঃ) তারা (অর্থাৎ অপবাদ আরোপকারীরা) কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? (যা ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য শর্ত।) অতঃপর যখন তারা (নিয়ম অনুযায়ী) সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন আল্লাহ্র কাছে (যে আইন আছে, তার দিক দিয়ে) তারাই মিথ্যাবাদী। (অতঃপর অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে যারা মু'মিন ছিল, তাদের প্রতিও রহমতের কথা বলা হচ্ছেঃ) যদি (হে হাসসান, মিসতাহ্ ও হামনাহ্) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত ইহকালে (যেমন তওবার সময় দিয়েছেন) এবং পরকালে, (যেমন তওবার তওফীক দিয়ে তা কবূলও করেছেন। এরূপ না হলে) তবে তোমরা যে কাজে লিপ্ত হয়েছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত যেমন তওবা না করার কারণে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে স্পর্শ করবে, যদিও এখন দুনিয়াতে তাকেও অবকাশ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু উভয় জাহানে তার প্রতি রহমত নেই। এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের তওবা কবূল হবে এবং তাঁরা পাক অবস্থায় পরকালে আল্লাহ্র রহমতপ্রাপ্ত হবেন। عليكم এ ঈমানদারগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর ইঙ্গিত প্রথমত উপরের আয়াতে ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ দ্বিতীয়ত فِي الْآخِرَةِ বলা। কেননা, মুনাফিক তো পরকালে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। অতএব তারা নিশ্চিতই পরকালে রহমতপ্রাপ্ত হতে পারবে না এবং তৃতীয়ত সম্মুখে يَعِظُكُمُ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ——আয়াতে তাবারানী ইবনে আব্বাসের উক্তি বর্ণনা করেন যে, لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ يريد مسطحا و حمنة و حسانا ——এ শুধু তিনজন মু'মিনকে সম্বোধন করা হয়েছে——মিসতাহ্, হামনাহ্ ও হাসসান। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মু'মিনদের তওবার তওফীক ও তওবা কবূল করে যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তবে তারা যে কাজ করেছিল, তা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে গুরুতর আযাবের কারণ ছিল। বলা হয়েছেঃ) যখন তোমরা এই মিথ্যা কথাটিকে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন (প্রমাণভিত্তিক) জ্ঞান তোমাদের ছিল না (এই খবরের বর্ণনাকারী যে মিথ্যাবাদী, তা

فَاُوْلٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ বাক্যে বিবৃত হয়েছে।) তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহ্র কাছে গুরুতর (অর্থাৎ মহাপাপের কারণ) ছিল। [প্রথমত কোন সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ স্বয়ং মস্ত গোনাহ্; তদুপরি নারীও কে? রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্রা স্ত্রী, যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা রসূলে মাকবুল (সা)-এর মনোবেদনার কারণ হয়েছে। সুতরাং এতে গোনাহের অনেক কারণ একত্রিত হয়েছে।] তোমরা যখন এ কথা (প্রথমে) শুনলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের জন্য শোভন নয়। আমরা আল্লাহ্র আশ্রয় চাই; এ তো গুরুতর অপবাদ। (কোন কোন সাহাবী এ কথা বলেও ছিলেন; যেমন সা'দ ইব্নে মু'আয, যায়দ ইবনে হারিসা ও আবূ আইউব (রা)। আরও অনেকে হয়তো বলে থাকবেন। উদ্দেশ্য এই যে, অপবাদ আরোপকারী এবং নিশ্চুপ ব্যক্তি সবারই এ কথা বলা উচিত ছিল। এ পর্যন্ত অতীত কাজের জন্য তিরস্কার ছিল। এখন, ভবিষ্যতের জন্য উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যা তিরস্কারের আসল উদ্দেশ্য। বলা হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের কাজ করো না। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পরিষ্কার করে বিধান বর্ণনা করেন (উপরোল্লিখিত উপদেশ, অপবাদের হদ, তওবা কবূল ইত্যাদি সব এর অন্তর্ভুক্ত।) আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [তোমাদের অন্তরের অনুশোচনার অবস্থাও তিনি জানেন। ফলে তওবা কবূল করেছেন এবং শাসনের রহস্য সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত। তাই শাসনের কারণে তোমাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিয়েছেন। (ইব্নে আব্বাস---দুররে মনসূর) এ পর্যন্ত পবিত্রতার আয়াত নাযিলের পূর্বে যারা অপবাদের চর্চা করত, তাদের কথা আলোচনা করা হল। অতঃপর তাদের কথা বলা হচ্ছে, যারা পবিত্রতার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও কুৎসা রটনায় বিরত হয় না। বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যক্তি বেঈমানই হবে। বলা হচ্ছে ঃ] যারা (এসব আয়াত অবতরণের পরেও) পছন্দ করে (অর্থাৎ কার্যত চেষ্টা করে) যে, মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীল কথা প্রচার লাভ করুক (অর্থাৎ মুসলমানগণ নির্লজ্জ কাজ করে---এ সংবাদ প্রসার লাভ করুক। সারকথা এই যে, যারা এই পবিত্র লোকজনের প্রতি ব্যভিচার আরোপ করে) তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (নির্ধারিত) রয়েছে। (এ কারণে শাস্তির জন্য বিস্মিত হয়ো না; কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা জানেন (যে, কোন গোনাহ্ কোন স্তরের) এবং তোমরা [এর স্বরূপ পুরোপুরি) জান না। (ইবনে আব্বাস---দুররে মনসূর) এরপর যারা তওবা করে পরকালের আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে, তাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে ঃ] এবং (হে তওবাকারিগণ) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, (যে কারণে তোমরা তওবার তওফীক লাভ করেছ) এবং আল্লাহ্ দয়ালু ও মেহেরবান না হতেন, (যে কারণে তিনি তোমাদের তওবা কবূল করেছেন) তবে তোমরাও (এই হুমকি থেকে) বাঁচতে পারতে না। (অতঃপর মুসলমানগণকে উল্লিখিত গোনাহ্সহ সকল প্রকার গোনাহ্ থেকে বিরত থাকার আদেশ এবং তওবা দ্বারা আত্মশুদ্ধির কথা বলা

হচ্ছে, যা গুরুত্বদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ইরশাদ করা হচ্ছে যে) হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না (অর্থাৎ তার প্ররোচনায় কাজ করো না) যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে; শয়তান তো (সর্বদা প্রত্যেক ব্যক্তিকে) নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে (যেমন এই অপবাদের ঘটনায় তোমরা প্রত্যক্ষ করেছ। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার এবং গোনাহ্ অর্জন করার পর তার অবধারিত অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে মুক্তি দেওয়াও আমারই অনুগ্রহ ছিল। নতুবা) যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও (তওবা করে) পবিত্র হতে পারত না। (হয় তওবার তওফীকই হত না; যেমন মুনাফিকদের হয়নি; না হয় তওবা কবুল করা হত না। কেননা আমার ওপর কোন বিষয় ওয়াজিব নয়।) কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান, (তওবার তওফীক দিয়ে) পবিত্র করেন। (তওবার পর নিজ কৃপায় তওবা কবুল করার ওয়াদাও করেছেন।) আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু শোনেন, জানেন। (সুতরাং তোমাদের তওবা শুনেছেন এবং তোমাদের অনুশোচনা জেনেছেন। তাই অনুগ্রহ করেছেন। এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, পবিত্রতার আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবূ বকরসহ অন্য কয়েকজন সাহাবী ক্রোধের আতিশয্যে কসম খেয়ে ফেললেন যে, যারা এই অপবাদ রটনায় অংশগ্রহণ করেছে, এখন থেকে আমরা তাদেরকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য করব না। বলা বাহুল্য, তাদের মধ্যে কয়েকজন অভাবগ্রস্তও ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ত্রুটি ক্ষমা করে সাহায্য পুনর্বহাল করার জন্য বলেন ঃ) তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্যশালী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র পথে হিজরত-কারীদেরকে কিছুই দেবে না। (অর্থাৎ তারা যেন এই কসমের ওপর কায়েম না থাকে এবং কসম ভেঙ্গে দেয়। নতুবা কসম তো হয়েই গিয়েছিল। অর্থাৎ উল্লিখিত গুণাবলীর কারণে তাদেরকে সাহায্য করা উচিত; বিশেষত যার মধ্যে সাহায্যের কোন হেতু বিদ্যমান আছে, যেমন হযরত মিসতাহ্ হযরত আবূ বকরের আত্মীয় ছিলেন এবং মিসকীন ও মুহাজিরও ছিলেন। অতঃপর উৎসাহদানের জন্য বলা হয়েছে ঃ) তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ত্রুটি ক্ষমা করেন? (অতএব তোমরাও দোষী ব্যক্তিদেরকে ক্ষমা করে দাও।) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল পরম করুণাময়। (অতএব তোমা-দেরও আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হওয়া উচিত। অতঃপর মুনাফিকদের প্রতি উচ্চারিত শাস্তিবাণী ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যা ওপরে إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الآية—আয়াতে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ) যারা (আয়াত নাযিল হওয়ার পর) সতী-সাধ্বী, নিরীহ ও ঈমানদার নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, [যাদের পবিত্রতা কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবিদের সবাইকে শামিল হওয়ার জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। যারা এমন পবিত্রা নারীদেরকে অভিযুক্ত করে; বলা বাহুল্য, তারা কাফির ও মুনাফিকই হতে পারে।] তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত (অর্থাৎ তারা কুফরের কারণে উভয় জাহানে

আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত থেকে দূরে থাকবে) এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্‌বা সাক্ষ্য দেবে এবং তাদের হস্তপদও (সাক্ষ্য দেবে) যা কিছু তারা করত। (উদাহরণত জিহ্‌বা বলবে, সে আমার দ্বারা অমুক অমুক কুফরের কথা বলেছে এবং হস্তপদ বলবে, সে কুফরের বিষয়াদি প্রচলিত করার জন্য এমন-এমন চেষ্টা সাধনা করেছে।) সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং (সেদিন ঠিক ঠিক) তারা জানবে যে, আল্লাহ্ সত্য ফয়সালাকারী এবং স্পষ্ট ব্যক্তকারী (অর্থাৎ এখন তো কুফরের কারণে এ বিষয়ে তাদের যথার্থ বিশ্বাস নেই; কিন্তু কিয়ামতের দিন বিশ্বাস হয়ে যাবে এবং বিশ্বাস হওয়ার পর মুক্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাবে। কেননা, তাদের উপযুক্ত ফয়সালা হবে চিরন্তন আযাব। এই আয়াতগুলো তওবা করেনি এমন লোকদের সম্পর্কে, যারা পবিত্রতার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও অপবাদের বিশ্বাস থেকে বিরত হয়নি। তওবা-কারীদেরকে فَضْلُ اللّٰهِ وَرَحْمَتُهٗ আয়াতে উভয় জাহানে রহমতপ্রাপ্ত বলা হয়েছে এবং তওবা করেনি, এমন লোকদেরকে لُعِنُوْا বলে উভয় জাহানে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। তওবাকারীদেরকে لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ বাক্যে আযাব থেকে নিরাপদ বলা হয়েছিল এবং তওবা করেনি এমন লোকদেরকে لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ বলে এবং এর আগে وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ বলে আযাবে লিপ্ত বলা হয়েছে। তওবাকারীদের জন্য اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ---বাক্যে ক্ষমা ও গোনাহ্ উপেক্ষা করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল এবং তওবা করেনি, এমন লোকদের জন্য تَشْهَدُ ও يُوَفِّيْهِمُ বাক্যে ক্ষমা না করা ও লাঞ্ছিত করার হুমকি উচ্চারণ করা হয়েছে। তওবাকারীদেরকে مَا زَكٰى مِنْكُمْ বাক্যে পবিত্র বলা হয়েছিল এবং তওবা করেনি, এমন লোকদেরকে পরবর্তী আয়াতে خَبِيْثٰتُ তথা দুশ্চরিত্র বলা হয়েছে। একেই পবিত্রতার বিষয়বস্তুর প্রমাণ হিসেবে পেশ

করে আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সামগ্রিক নীতি যে) দুশ্চরিত্রা নারী-কুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য উপযুক্ত এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য উপযুক্ত এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। (এ হচ্ছে প্রমাণের এক বাক্য। এর সাথে আরও একটি স্বতঃসিদ্ধ বাক্য সংযোজিত হবে। তা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রত্যেক বস্তু তাঁর জন্য যোগ্য ও উপযুক্তই দেওয়া হয়েছে এবং তা পবিত্র বৈ নয়। অত-এব এই স্বতঃসিদ্ধ বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিবিগণও সচ্চরিত্রা । তাঁরা সচ্চরিত্রা হলে এই বিশেষ অপবাদ থেকে হযরত সাফওয়ানের নিষ্কলুষতাও জরুরী হয়ে পড়ে। তাই পরের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ) তাঁদের সম্পর্কে (মুনাফিক) লোকেরা যা বলে বেড়ায়, তা থেকে তাঁরা পবিত্র। তাঁদের জন্য (পরকালে) ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা (অর্থাৎ জান্নাত) আছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত আয়েশা সিদ্দীকার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী এবং অপবাদ-কাহিনীর অবশিষ্টাংশ ঃ শত্রুরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত অপকৌশল প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেনি। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার জন্য যে যে উপায় তাদের মস্তিষ্কে উদিত হতে পারত, তা সবগুলোই তারা সন্নিবেশিত করেছে। কাফিরদের তরফ থেকে তিনি যে-সব কষ্ট পেয়েছেন, তন্মধ্যে সম্ভবত এটাই ছিল সর্বশেষ কঠোর ও মানসিক কষ্ট। মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই পবিত্র বিবিগণের মধ্যে সর্বাধিক বিদুষী, জ্ঞান-গরিমায় সমুন্নত ও পবিত্রতমা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ও তাঁর সাথে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালের ন্যায় ধর্মপ্রাণ সাহাবীর বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ রটনা করল। মুনাফিকরা এতে রঙ চরিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল। এতে সর্বাধিক দুঃখজনক বিষয় ছিল এই যে, কয়েকজন সরলপ্রাণ মুসলমানও তাদের চক্রান্তে প্রভাবান্বিত হয়ে অপবাদের চর্চা করতে লাগল। এই ভিত্তিহীন, প্রমাণহীন ও উড়ে আসা অপবাদের স্বরূপ কয়েকদিনের মধ্যে আপনা-আপনিই খুলে যেত ; কিন্তু স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও উম্মুল মু'মিনীনের মানসিক ক্লেশ মোচনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর কোন প্রকার ইঙ্গিতকে যথেষ্ট মনে করেননি ; বরং কোরআনের প্রায় দুইটি রুকূ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য নাযিল করেন। যারা এই অপবাদ রচনা করে অথবা এর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে, তাদের সবার প্রতি এমন কঠোর ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়, যা বোধ হয় ইতিপূর্বে অন্য কোন ক্ষেত্রে উচ্চারণ করা হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে এই অপবাদ-ঘটনা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার সতীত্ব ও পবিত্রতার সাথে সাথে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-গরিমাকেও ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। এ কারণেই উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, তোমরা এই দুর্ঘটনাকে তোমাদের জন্য খারাপ মনে করো না ; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। বলা বাহুল্য, এর চাইতে বড় মঙ্গল আর কি হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা দশটি আয়াতে তাঁর

পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই আয়াতগুলো কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত করা হবে। স্বয়ং আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন ঃ আমার নিজের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আমার সাফাই ও পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন ; কিন্তু আমি নিজেকে এর উপযুক্ত মনে করতাম না যে, কোরআনে চিরকাল পঠিত হবে, এমন আয়াতসমূহ আমার ব্যাপারে নাযিল করা হবে। এ স্থলে ঘটনার আরও কিছু বিবরণ জেনে নেওয়াও আয়াতসমূহের তফসীর হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে সহায়ক হবে। তাই সংক্ষেপে তা বর্ণিত হচ্ছে ঃ

সফর থেকে ফিরে আসার পর হযরত আয়েশা গৃহকর্মে মশগুল হয়ে গেলেন। মুনাফিকরা তাঁর সম্পর্কে কি কি খবর রটনা করছে, সে ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না। বুখারীর রেওয়ায়েতে স্বয়ং হযরত আয়েশা বলেন ঃ সফর থেকে ফিরে আসার পর আমি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এই অসুস্থতার প্রধান কারণ ছিল এই যে, আমি এ যাবৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে যে ভালবাসা ও কৃপা পেয়ে এসেছিলাম, তা অনেকটা হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে তিনি প্রত্যহ গৃহে এসে সালাম করতেন এবং অবস্থা জিজ্ঞেস করে ফেরত চলে যেতেন। আমার সম্পর্কে কি খবর রটনা করা হচ্ছে, আমি যেহেতু তা জানতাম না, তাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই ব্যবহারের হেতু আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হত না। আমি এই আগুনেই দগ্ধ হতে লাগলাম। একদিন দুর্বলতার কারণে মিসতাহ্ সাহাবীর জননী উম্মে মিস্‌তাহ্‌কে সাথে নিয়ে আমি বাহ্যের প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে গৃহের বাইরে গেলাম। কেননা, তখন পর্যন্ত গৃহে পায়খানা তৈরি করার প্রচলন ছিল না। যখন আমি প্রয়োজন সেরে গৃহে ফিরতে লাগলাম, তখন উম্মে মিস্‌তাহ্‌র পা তার বড় চাদরে জড়িয়ে গেল। সে মাটিতে পড়ে গেল। তখন তার মুখ থেকে এই বাক্য বেরিয়ে পড়ল تعس مسطح (মিস্‌তাহ্ নিপাত যাক)। আরবে এই বাক্যটি বদদোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। জননীর মুখে পুত্রের জন্য বদদোয়ার বাক্য শুনে হযরত আয়েশা বিস্মিতা হলেন। তিনি বললেন ঃ এ তো খুবই খারাপ কথা! তুমি একজন সৎ লোককে মন্দ বলছ। সে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তখন উম্মে মিস্‌তাহ্ আশ্চর্যান্বিতা হয়ে বলল ঃ মা, তুমি কি জান না আমার পুত্র মিস্‌তাহ্ কি বলে বেড়ায়? আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ সে কি বলে? তখন তার জননী আমাকে অপবাদকারীদের অপবাদ অভিযানের আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং মিস্‌তাহ্‌র তাদের সাথে জড়িত থাকার কথা বর্ণনা করল। হযরত আয়েশা বলেন ঃ একথা শুনে আমার অসুস্থতা দ্বিগুণ হয়ে গেল। আমার গৃহে ফেরার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) যথারীতি গৃহে এলেন, সালাম করলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তখন আমি তাঁর কাছে পিতামাতার গৃহে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। পিতামাতার কাছে এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমি সেখানে পৌঁছে মাতাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ মা, তোমার মত মেয়েদের শত্রু থাকেই এবং তারাই এ ধরনের কথাবার্তা ছড়ায়। তুমি চিন্তা করো না।

আপনা-আপনিই ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি বললাম ঃ সোবহানাল্লাহ! সাধারণের মধ্যে এ বিষয়ের চর্চা হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আমি কিরূপে সবর করব? আমি সারারাত কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিলাম। মুহূর্তের জন্যও আমার অশ্রু থামেনি এবং চক্ষু লাগেনি। অপরদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার কারণে দারুণ মর্মাহত ছিলেন। এই কয়দিনে এ ব্যাপারে কোন ওহীও তাঁর কাছে আগমন করেনি। তাই পরিবারেরই লোক হযরত আলী (রা) ও উসামা ইবনে যায়েদের কাছে পরামর্শ চাইলেন যে, এমতাবস্থায় আমার কি করা উচিত? হযরত উসামা পরিষ্কার আরয করলেন ঃ যতদূর আমি জানি, হযরত আয়েশা সম্পর্কে কোনরূপ কুধারণাই করা যায় না। তাঁর চরিত্রে এমন কিছু নেই, যদ্দ্বারা কুধারণার পথ সৃষ্টি হতে পারে। আপনি এসব গুজবের পরওয়া করবেন না। হযরত আলী (রা) তাঁকে চিন্তা ও অস্থিরতার কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য পরামর্শ দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা করেননি। গুজবের কারণে হযরত আয়েশার প্রতি মন কিছুটা মলিন হয়ে থাকলে আরও অনেক মহিলা আছে। হযরত আয়েশার বাঁদী বরীরার কাছ থেকে খোঁজখবর নিলেও আপনার মনের এই মলিনতা দূর হতে পারে। সেমতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বরীরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বরীরা আরয করল ঃ অন্য কোন দোষ তো তাঁর মধ্যে দেখিনি; তবে এতটুকু জানি যে, তিনি কচি বয়সের মেয়ে। মাঝে মাঝে আটা গুলিয়ে রেখে দেন এবং নিজে ঘুমিয়ে পড়েন। ছাগল এসে আটা খেয়ে যায়। (এরপর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভাষণ দান, মিম্বরে দাঁড়িয়ে অপবাদ ও গুজব রটনাকারীদের অভিযোগ বর্ণনা ইত্যাকার দীর্ঘ কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী সংক্ষিপ্ত কাহিনী এই যে) হযরত আয়েশা বলেন ঃ আমার সারাদিন ও পরবর্তী সারারাতও অবিরাম কান্নার মধ্যে অতিবাহিত হল। আমার পিতামাতাও আমার কাছে চলে এসেছিলেন। তারা আশংকা করছিলেন যে, কাঁদতে কাঁদতে আমার কলিজা যদি ফেটে যায়! আমার পিতামাতা আমার কাছেই উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (সা) ঘরে এসে আমার কাছে বসে গেলেন। যেদিন থেকে এই ঘটনা চালু হয়েছিল, তারপর থেকে পূর্বে তিনি কখনও আমার কাছে এসে বসেননি। এরপর তিনি সংক্ষেপে শাহাদতের খুতবা পাঠ করে বললেন ঃ হে আয়েশা, তোমার সম্পর্কে আমার কানে এই এই কথা পৌঁছেছে। যদি তুমি দোষমুক্ত হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তোমাকে মুক্ত ঘোষণা করবেন (অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করবেন)। পক্ষান্তরে যদি তুমি ভুল করে থাক, তবে আল্লাহ্র কাছে তওবা ও ইস্তিগফার কর। বান্দা তার গোনাহ্ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বক্তব্য শেষ করতেই আমার অশ্রু একেবারে শুকিয়ে গেল। আমার চোখে একবিন্দু অশ্রুও আর রইল না। আমি পিতা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বললাম ঃ আপনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথার উত্তর দিন। পিতা বললেন ঃ আমি এ কথার কি উত্তর দিতে পারি। অতঃপর আমি মাকে বললাম ঃ আপনি উত্তর দিন। তিনিও ওযর পেশ করে বললেন ঃ আমি কি জওয়াব দেব! তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই মুখ খুলতে হল। আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা

বালিকা। এখন পর্যন্ত কোরআনও বেশি পড়িনি। পাঠকবর্গ চিন্তা করুন, এহেন দুশ্চিন্তা ও চরম বিষাদময় অবস্থায় শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত ব্যক্তিদের পক্ষেও যুক্তিপূর্ণ কথা বলা সহজ হয় না। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) যা বললেন, তা নিঃসন্দেহে প্রগাঢ় জ্ঞানী ও বিজ্ঞসুলভ উক্তি। নিম্নে তাঁর বক্তব্য হুবহু তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃত করা হল ঃ

والله لقد عرفت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى انفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم انى بريئة والله يعلم انى بريئة لا تصدقونى ولئن اعترفت لكم بامر والله يعلم انى منه بريئة لتصدقونى والله لا اجد لى ولكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون -

"আল্লাহ্‌র কসম, আমার জানা হয়ে গেছে যে, এই অপবাদ বাক্যটি উপর্যুপরি শোনার কারণে আপনার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং আপনি কার্যত তা সমর্থন করেছেন। এখন যদি আমি বলি যে, আমি এই দোষ থেকে মুক্ত; যেমন আল্লাহ্ তা'আলাও জানেন যে, আমি মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবেন না। পক্ষান্তরে আমি যদি এমন দোষ স্বীকার করে নেই, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা মেনে নেবেন। আল্লাহ্‌র কসম, আমি নিজের ও আপনার ব্যাপারে এটা ব্যতীত দৃষ্টান্ত পাই না যা ইউসুফ (আ)-এর পিতা ইয়াকুব (আ) পুত্রদের ভ্রান্ত কথাবার্তা শুনে বলেছিলেন ঃ আমি সবরে জমীল অবলম্বন করছি এবং তোমরা যা কিছু বর্ণনা করছ, সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।"

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ এতটুকু কথা বলে আমি পৃথক নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, আমি বাস্তবে যেমন দোষমুক্ত আছি আল্লাহ্ তা'আলা আমার দোষমুক্ততার বিষয় অবশ্যই ওহীর মাধ্যমে প্রকাশ করে দেবেন। কিন্তু এরূপ কল্পনাও ছিল না যে, আমার ব্যাপারে চিরকাল পঠিত হবে, কোরআনের এমন আয়াত নাযিল হবে। কারণ, আমি আমার মর্তবা এর চাইতে অনেক কম অনুভব করতাম। এরূপ ধারণা ছিল যে, সম্ভবত স্বপ্নযোগে আমার দোষমুক্ততার বিষয় প্রকাশ করা হবে। হযরত আয়েশা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) মজলিসেই বসা ছিলেন এবং গৃহের লোকদের মধ্যেও কেউ তখনও উঠেনি, এমতাবস্থায় তাঁর মধ্যে এমন ভাবান্তর উপস্থিত হল, যা ওহী অবতরণের সময় উপস্থিত হত। ফলে, কন্‌কনে শীতের মধ্যেও তাঁর কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। এই ভাবান্তর দূর হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) হাসিমুখে গাত্রোত্থান করলেন এবং সর্বপ্রথম যে কথা বললেন, তা ছিল এই ঃ

ابشرى يا عائشة اما الله فقد ابرأك ---অর্থাৎ হে আয়েশা, সুসংবাদ শোন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দোষমুক্ত করেছেন। আমার মা বললেন ঃ দাঁড়াও আয়েশা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যাও। আমি বললাম ঃ না মা, আমি এ ব্যাপারে

আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ঋণ স্বীকার করি না। আমি দাঁড়াব না। আমি আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে মুক্ত করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা)-র কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ ইমাম বগভী উপরোক্ত আয়াত-সমূহের তফসীরে বলেছেন ঃ হযরত আয়েশার এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো অন্য কোন মহিলার ভাগ্যে জোটেনি। তিনি নিজেও আল্লাহ্র নিয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় গর্বভরে বর্ণনা করতেন। প্রথম, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহে আসার পূর্বে ফেরেশতা জিবরাঈল একটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করেন এবং বলেন ঃ এ আপনার স্ত্রী।---(তিরমিযী) কোন কোন রেও-য়ায়েতে আছে, জিবরাঈল তাঁর হাতের তালুতে এই ছবি নিয়ে এসেছিলেন।

দ্বিতীয়, রসূলুল্লাহ্ তাঁকে ছাড়া কোন কুমারী বালিকাকে বিবাহ করেননি। তৃতীয়, তাঁর কোলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়। চতুর্থ, হযরত আয়েশার গৃহেই তিনি সমাধিস্থ হন। পঞ্চম, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কখনও ওহী অবতীর্ণ হত, যখন তিনি হযরত আয়েশার সাথে এক লেপের নিচে শায়িত থাকতেন। অন্য কোন বিবির এরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল না। ষষ্ঠ, আসমান থেকে তাঁর দোষমুক্ততার বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে। সপ্তম, তিনি রসূলুল্লাহ (সা)-এর খলীফার কন্যা এবং সিদ্দীকা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেই যাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছেন, তিনি তাদেরও অন্যতমা।

হযরত আয়েশার ফকীহ্ ও পণ্ডিতসুলভ জ্ঞানানুসন্ধান এবং বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য দেখে হযরত মূসা ইবনে তালহা (রা) বলেন ঃ আমি আয়েশা সিদ্দীকার চাইতে অধিক শুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী কাউকে দেখিনি।---(তিরমিযী)

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, ইউসুফ (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার সাক্ষ্য দ্বারা তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন। হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পুত্র ঈসা (আ)-র সাক্ষ্য দ্বারা তাঁকে দোষমুক্ত করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের দশটি আয়াত নাযিল করে তাঁর দোষমুক্ততা ঘোষণা করেন, যা তাঁর গুণ ও জ্ঞান-গরিমাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তফসীর, তফসীরের সার-সংক্ষেপে আলো-চিত হয়ে গেছে। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ বাক্য সম্পর্কে যেসব আলোচনা আছে, সেগুলো দেখা যেতে পারে।

إِفْكٌ—إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ শব্দের আভিধানিক অর্থ পাল্টিয়ে দেয়া, বদলিয়ে দেয়া। যে জঘন্য মিথ্যা সত্যকে বাতিলরূপে, বাতিলকে

সত্যরূপে বদলিয়ে দেয় এবং ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ্‌ভীরুকে ফাসিক ও ফাসিককে আল্লাহ্‌-ভীরু পরহিযগার করে দেয়, সেই মিথ্যাকেও افك বলা হয়। عصبة শব্দের অর্থ দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত লোকের দল। এর কমবেশির জন্যও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। منكم বলে মু'মিনদেরকে বোঝানো হয়েছে। এই অপবাদের প্রকৃত রচয়িতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মু'মিন নয়---মুনাফিক ছিল; কিন্তু মুনাফিকরা মুসলমানী দাবি করত বিধায় তাদের ক্ষেত্রেও মু'মিনদের বাহ্যিক বিধানাবলী প্রযোজ্য হত। তাই منكم শব্দে তাকেও শামিল করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক এতে জড়িত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। অতঃপর মু'মিনগণ সবাই তওবা করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করেন। হযরত হাসসান ও মিস্‌তাহ্ তাদেরই অন্যতম ছিলেন। তারা উভয়েই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর যোদ্ধাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে মাগফিরাত ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই হযরত আয়েশার সামনে কেউ হাসসানকে মন্দ বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না; যদিও তিনি অপবাদের শাস্তি-প্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন। হযরত আয়েশা বলতেনঃ হাসান রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে কাব্যমধ্যে কাফিরদের চমৎকার মুকাবিলা করেছেন। কাজেই তাকে মন্দ বলা সঙ্গত নয়। হাসসান কোন সময় হযরত আয়েশার কাছে আগমন করলে তিনি সসম্ভ্রমে তাঁকে আসন দিতেন।---(মাযহারী)

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم---এতে নবী করীম (সা)-হযরত আয়েশা, সাফওয়ান ও সকল মু'মিন মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা সবাই এই গুজবের কারণে মর্মাহত ছিলেন। অর্থ এই যে, এই গুজবকে তোমরা খারাপ মনে করো না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে তাদের দোষমুক্ততা নাযিল করে তাদের সম্মান আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং যারা এই কুকাণ্ড করেছিল, তাদের সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী নাযিল করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হবে।

وَلِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ---অর্থাৎ যারা এই অপবাদে যতটুকু অংশ নিয়েছে, সেই পরিমাণে তার গোনাহ্ লিখিত হয়েছে এবং সেই অনুপাতেই তার শাস্তি হবে। যে ব্যক্তি এই খবর রচনা করে চালু করেছে, সে সর্বাধিক আযাব ভোগ করবে। যে খবর শুনে সমর্থন করেছে, সে তদপেক্ষা কম এবং যে শুনে নিশ্চুপ রয়েছে, সে আরও কম আযাবের যোগ্য হবে।

وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ---كبر শব্দের অর্থ বড়। উদ্দেশ্য এই

যে, যে ব্যক্তি এই অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ একে রচনা করে চালু করেছে, তার জন্য গুরুতর আযাব আছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই।---(বগভী)

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ——অর্থাৎ তোমরা যখন এই অপবাদের সংবাদ শুনলে, তখন মুসলমান পুরুষ ও নারী নিজেদের সম্পর্কে অর্থাৎ মুসলমান ভাইবোনদের সম্পর্কে সুধারণা করল না কেন এবং একথা বলল না কেন যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা? এই আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম. بِاَنْفُسِهِمْ শব্দ দ্বারা কোরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের দুর্নাম রটায় ও তাকে লাঞ্ছিত করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই লাঞ্ছিত করে। কারণ, ইসলামের সম্পর্ক সবাইকে এক করে দিয়েছে। এ ধরনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন এই ইঙ্গিত ব্যবহার করেছে; যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে, لَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ——অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না। উদ্দেশ্য, কোন মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি দোষারোপ করো না। অন্যত্র বলা হয়েছে لَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ——অর্থাৎ নিজেদেরকে হত্যা করো না। এখানেও কোন মুসলমান ভাইকে হত্যা করা বোঝানো হয়েছে। আরও এক জায়গায় আছে وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ——নিজেদেরকে অর্থাৎ কোন মুসলমান ভাইকে গৃহ ত্যাগে বাধ্য করো না। আরও বলা হয়েছে, وَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ——নিজেদেরকে অর্থাৎ মুসলমান ভাইকে সালাম কর। কোরআন পাকের এসব আয়াতের প্রাসঙ্গিক নির্দেশ এই যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি দোষারোপ করে কিংবা তার ক্ষতি সাধন করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে দোষী ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা, সমগ্র জাতির অপমান ও দুর্নামই এর পরিণতি। সাদী বলেন ঃ

چو از قومے یکے بے دانشی کرد
نہ کہ را منزلت ماند نہ مہ را

কোরআনের এই শিক্ষার প্রভাবেই মুসলমানগণ যখন উন্নতি করেছে, তখন সমগ্র জাতি উন্নতি করেছে, প্রত্যেক ব্যক্তি করেছে। এই শিক্ষা পরিত্যাগের ফলেই আজ দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র জাতি অধঃপতিত হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি অধঃপতিত হয়েছে। এই আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে স্থানের দিকে লক্ষ্য করলে لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَنتُم بِأَنفُسِكُمْ خَيْرًا ---সম্বোধন পদে বলা উচিত ছিল; যেমন শুরুতে سَمِعْتُمُوهُ সম্বোধন পদে বলা হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাক এই সংক্ষিপ্ত বাক্য ছেড়ে দিয়ে পদ্ধতি পরিবর্তন করত সম্বোধনপদের পরিবর্তে ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ বলেছে। এতে হালকা ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের সীমায় মু'মিন কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে—এটাই ছিল ঈমানের দাবি।

এখানে তৃতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই, আয়াতের শেষ বাক্য هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, খবরটি শোনা মাত্রই মুসলমানদের 'এটা প্রকাশ্য মিথ্যা' বলে দেয়াই ছিল ঈমানের দাবি। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান সম্পর্কে কোন গোনাহ্ অথবা দোষ শরীয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা না জানা পর্যন্ত তার প্রতি সুধারণা রাখা এবং প্রমাণ ছাড়াই তাকে গোনাহ্ ও দোষে অভিযুক্ত করাকে মিথ্যা মনে করা সাক্ষাত ঈমানের পরিচয়।

মাস'আলা ঃ এতে প্রমাণিত হল যে, প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি সুধারণা রাখা ওয়াজিব। তবে শরীয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা বিপরীত প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। যদি কেউ শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়া মুসলমানকে অভিযুক্ত করে, তার কথা প্রত্যাখ্যান করা ও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। কারণ, এটা নিছক গীবত (পরনিন্দা) এবং অহেতুক মুসলমানকে হেয় করা।
---(মাযহারী)

لَوْلَا جَاءُوْا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ——এই আয়াতের প্রথম বাক্যে শিক্ষা আছে যে, এরূপ খবর রটনাকারীদের কথা চালু করার পরিবর্তে মুসলমানদের উচিত ছিল তাদের কাছে প্রমাণ দাবি করা। ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত প্রমাণ চারজন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে এরূপ দাবি করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা মুখ বন্ধ কর। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহ্‌র কাছে তারাই মিথ্যাবাদী।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এক ব্যক্তি স্বচক্ষে কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করল এবং সে অন্য সাক্ষী পেল না, এটা অসম্ভব ও অবাস্তব নয়। এখন যদি এই ব্যক্তি নিজের চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করে, তবে তাকে মিথ্যাবাদী কিরূপে বলা যায়, বিশেষত আল্লাহ্‌র কাছে মিথ্যাবাদী বলা তো কোনরূপেই বুঝে আসে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সব ঘটনার স্বরূপ জানেন এবং এই ঘটনাও তিনি জানেন। এমতাবস্থায় সে আল্লাহ্‌র কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে কিরূপে? এই প্রশ্নের দুই জওয়াব আছে। প্রথম, এখানে 'আল্লাহ্‌র কাছে' বলার অর্থ আল্লাহ্‌র বিধান ও আইন। অর্থাৎ এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আইনের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে। কারণ, আল্লাহ্‌র বিধান ছিল এই যে, চারজন সাক্ষী না হলে ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তা বর্ণনা না করা। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ব্যতিরেকেই বর্ণনা করে, সে আইনত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করবে।

দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, অনর্থক কোন কাজ না করা মুসলমানের কর্তব্য; বিশেষত এমন কাজ, যার ফলে অন্য মুসলমানের প্রতি অভিযোগ আরোপিত হয়। অতএব এক মুসলমান অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন দোষ অথবা গোনাহের সাক্ষ্য গোনাহের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই দিতে পারে। কাউকে হেয় করা অথবা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে দিতে পারে না। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ছাড়া এ ধরনের দাবি করে; সে যেন দাবি করে যে, আমি মানব জাতির সংশোধন, সমাজকে কলুষমুক্তকরণ এবং অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে এ দাবী করছি। কিন্তু সে যখন শরীয়তের আইন জানে যে, চারজন সাক্ষী ছাড়া এরূপ দাবি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাজা পাবে না এবং অপরাধও প্রমাণিত হবে না; বরং উল্টা মিথ্যা বলার শাস্তি ভোগ করতে হবে, তখন সে আল্লাহ্‌র কাছে উপরোক্ত সদুদ্দেশ্যের দাবিতে মিথ্যাবাদী। কেননা শরীয়তের ধারা মোতাবিক দাবি না হওয়ার ক্ষেত্রে উপরোক্ত কর্ম সদুদ্দেশ্য হতেই পারে না। —(মাযহারী)

একটি গুরুত্বপূর্ণ হুশিয়ারী ঃ উপরোক্ত উভয় আয়াতে প্রত্যেক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং এর বিপরীত প্রমাণহীন কথাবার্তা নাকচ করে দেয়াকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে রসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্বেই সংবাদটিকে ভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করলেন না কেন এবং এর খণ্ডন করলেন না কেন? তিনি এক মাস পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কেন রইলেন? এমন কি, তিনি হযরত আয়েশাকে একথাও বলেছেন যে, দেখ, যদি তোমা দ্বারা কোন ভুল হয়ে থাকে, তবে তওবা করে নাও।

কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা সুধারণার আদেশের পরিপন্থী নয়। কেননা, তিনি খবরটির সত্যায়নও করেন নি এবং তদনুযায়ী কোন কর্মও করেন নি। তিনি এর চর্চা করাও পছন্দ করেন নি। সাহাবায়ে-কিরামের সমাবেশে তিনি এ কথাই বলেছেন যে, ما علمت على اهلى الا خيرا অর্থাৎ আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া কিছুই জানি না।----(তাহাভী) রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই কর্মপন্থা উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী আমল এবং সুধারণা পোষণ করার সাক্ষ্য বহন করে। তবে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাও দূর হয়ে যায়, এরূপ অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান আয়াত অবতরণের পরে অর্জিত হয়েছে।

মোটকথা এই যে, অন্তরে কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হওয়া এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা) করেছেন, মুসলমানদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার পরিপন্থী ছিল না। তিনি তো খবর অনুযায়ী কোন কর্মও করেন নি। যেমন মুসলমানদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং উভয় আয়াতে যাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে তারা খবর অনুযায়ী কর্ম করেছিল। তারা এর চর্চা করেছিল এবং ছড়িয়েছিল। তাদের এ কাজ আয়াত অবতরণের পূর্বেও অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য ছিল।

ولولا فضل الله عليكم و رحمته فى الدنيا و الاخرة لمسكم فى ما افضتم فيه عذاب عظيم ——যেসব মুসলমান ভুলক্রমে এই অপবাদে কোন-না-কোনরূপে অংশ গ্রহণ করেছিল, এরপর তওবা করেছিল এবং কেউ কেউ শাস্তিও ভোগ করেছিল, এই আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এই আয়াত তাদের সবাইকে একথাও বলেছে যে, তোমাদের অপরাধ খুবই গুরুতর ছিল। এর কারণ দুনিয়াতেও আযাব আসতে পারত; যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ওপর এসেছে এবং পরকালেও কঠোর শাস্তি হত। কিন্তু মু'মিনদের সাথে আল্লাহ তা'আলার আচরণ দয়া ও অনুগ্রহমূলক ইহকালেও এবং পরকালেও। তাই এই শাস্তি তোমাদের ওপর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহ্র

অনুগ্রহ ও রহমত এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রথমে তিনি ইসলাম ও ঈমানের তওফীক দিয়েছেন, এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংসর্গ দান করেছেন। এটা আযাব অবতরণের পথে প্রতিবন্ধক। এরপর কৃত গোনাহ্র জন্যে সত্যিকার তওবার তওফীক দিয়েছেন এবং তওবা কবুল করেছেন। পরকালে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা, মার্জনা ও মাগফিরাতের ওয়াদা দিয়েছেন।

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ—تلقى শব্দের মর্ম এই যে, একে অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করে বর্ণনা করে। এখানে কোন কথা শুনে তা সত্যাসত্য, যাচাই না করে সামনে চালু করে দেয়া বোঝানো হয়েছে।

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ—অর্থাৎ তোমরা একে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করেছিলে যে, যা শুনলে তা-ই অন্যের কাছে মহাপাপ ছিল। তোমরা সত্যাসত্য যাচাই না করে এমন কথা চালু করে দিয়েছিলে, যদ্দরুন অন্য মুসলমান দারুণ মর্মাহত হয়, লাঞ্ছিত হয় এবং তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে।

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ তোমরা যখন এই গুজব শুনেছিলে, তখন একথা কেন বলে দিলে না যে, এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের জন্যে বৈধ নয়। আল্লাহ্ পবিত্র। এ তো গুরুতর অপবাদ। এই আয়াতে পুনর্বার সেই আদেশই ব্যক্ত হয়েছে, যা পূর্বেকার এক আয়াতে ব্যক্ত হয়েছিল। এতে আরও প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ ধরনের সংবাদ শুনে মুসলমানদের কি করা উচিত। অর্থাৎ তারা পরিষ্কার বলে দেবে যে, কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করাও আমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা গুরুতর অপরাধ।

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব ঃ কেউ সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে, কোন ঘটনার সত্যতা যেমন প্রমাণ ছাড়া জানা যায় না, ফলে তার চর্চা করা ও মুখে উচ্চারণ করা অবৈধ হয়েছে, তেমনি কোন কথার অসত্যতাও তো প্রমাণ ছাড়া বোঝা যায় না। কাজেই এরূপ কথাকে গুরুতর অপবাদ কিরূপে বলা যেতে পারে? উত্তর এই যে, প্রত্যেক মুসলমানকে গোনাহ্ থেকে পাক-পবিত্র মনে করা শরীয়তের মূলনীতি। এই মূলনীতির বিরুদ্ধে বিনা দলীলে যে কথা বলা হবে, তাকে মিথ্যা মনে করার জন্য অন্য কোন দলীলের প্রয়োজন নেই। এতটুকুই যথেষ্ট যে, একজন মু'মিন-মুসলমানের প্রতি শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। কাজেই এটা মিথ্যা অপবাদ।

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ — যারা এই অপবাদে কোন-না-কোনরূপে অংশগ্রহণ করেছিল, এই আয়াতে পুনরায় তাদের নিন্দা এবং ইহকাল ও পরকালের শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে। আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, যারা এরূপ খবর রটনা করে, তারা যেন মুসলমানদের মধ্যে ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার প্রসারই কামনা করে।

নির্লজ্জতা দমনের কোরআনী ব্যবস্থা ও একটি জরুরী উপায়, যার উপেক্ষার ফলে আজ নির্লজ্জতার প্রসার ঘটেছেঃ কোরআন পাক নির্লজ্জতা দমনের জন্য এই বিশেষ কর্মসূচী তৈরী করেছে যে, প্রথমত এ ধরনের সংবাদ কোথাও রটিত হতে পারবে না। রটিত হলেও শরীয়তসম্মত প্রমাণ সহকারে রটিত হতে হবে, যাতে রটনার সাথে সাথে সাধারণ সমাবেশে ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করে রটনাকেই দমনের উপায় করে দেয়া যায়। যে ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত প্রমাণ নেই, সেখানে এ ধরনের নিলর্জ্জতার শাস্তিবিহীন সংবাদ চালু করা ও ব্যাপক প্রচার করা সাধারণ ভাবে মানুষের মন থেকে নিলর্জ্জতার ও ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা হ্রাস করে দিতে এবং অপরাধ-প্রবণতা সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে। আজকাল পত্র-পত্রিকায় প্রত্যহ দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের সংবাদ প্রত্যহ প্রত্যেক পত্রিকায় ঢালাওভাবে প্রচার করা হচ্ছে। যুবক-যুবতীরা সেগুলো পাঠ করে। এর অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরিণতি হয় এই যে, আস্তে আস্তে এই দুষ্কর্ম তাদের কাছে হালকা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং উত্তেজনা সৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই কোরআন পাক এ ধরনের সংবাদ প্রদানের অনুমতি তখনই দেয়, যখন এর সাথে শরীয়তসম্মত প্রমাণ থাকে। ফলে এর সাথে সাথে এই নির্লজ্জতার ভয়াবহ শাস্তিও দর্শক ও শ্রোতাদের সামনে এসে যাবে। প্রমাণ ও শাস্তি ছাড়া এ ধরনের সংবাদ প্রচারকে কোরআন মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতা ছড়ানোর উপায়রূপে আখ্যা দিয়েছে। আফসোস, মুসলমানগণ যদি এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করত! এই আয়াতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নির্লজ্জতার সংবাদ প্রচারকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। পরলোকের শাস্তি তো কিয়ামতের পরেই হবে, যা এখানে প্রত্যক্ষ করা যাবে না; কিন্তু ইহলোকের শাস্তি তো প্রত্যক্ষভাবে আসা উচিত। যাদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের ইহলোকের শাস্তি তো হয়েই গেছে। যদি কোন ব্যক্তি শর্তাবলীর অনুপস্থিতির কারণে অপবাদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়, তবে দুনিয়াতেও সে কিছু না কিছু শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আয়াতের সত্যতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ ۝ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ
اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

সাহাবায়ে-কিরামকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ঃ وَلَا يَأْتَلِ — ائتلاء শব্দের অর্থ কসম খাওয়া। হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে মিসতাহ্ ও হাসসান জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করেন। তাঁরা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাদের দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায় এবং তারা খাঁটি তওবার তওফীক লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন হযরত আয়েশার দোষমুক্ততা নাযিল করেন, এমনিভাবে এই মুসলমানদের তওবা কবুল করা ও ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন।

মিসতাহ্ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। তিনি তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তাঁর জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হল, তখন কন্যা-বৎসল পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক কন্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহ্‌র প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম খেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলা বাহুল্য, কোন বিশেষ ফকিরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ মুসলমানের ওপর ওয়াজিব নয়। কেউ কারও আর্থিক সাহায্য করার পর যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে গোনাহ্‌র কোন কারণ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের দলকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বের জন্য একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদেরকে খাঁটি তওবা এবং ভবিষ্যৎ সংশোধনের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্বভাবগত দুঃখের কারণে গরীবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম খেয়েছিল, তাদেরকে আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা আলোচ্য আয়াতে দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ভঙ্গ করে তার কাফফারা দিয়ে দেয়। গরীবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া তাদের উচ্চ মর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তাদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত।

হযরত মিসতাহ্‌কে আর্থিক সাহায্য করা হযরত আবু বকরের দায়িত্ব বা ওয়াজিব ছিল না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কথাটি এভাবে বলেছেন ঃ যেসব জ্ঞানী-গুণীকে আল্লাহ্

তা'আলা ধর্মীয় উৎকর্ষ দান করেছেন এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার আর্থিক সঙ্গতিও রাখে, তাদের এরূপ কসম খাওয়া উচিত নয়। আয়াতে اُولُوا الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ ----এ অর্থেই ব্যক্তি হয়েছে।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হইয়াছে ঃ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ---অর্থাৎ তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গোনাহ্ মাফ করবেন? আয়াত শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন ঃ وَاللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لِىْ ----অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি। এরপর তিনি হযরত মিসতাহ্‌র আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেন ঃ এ সাহায্য কোন দিন বন্ধ হবে না।---(বুখারী, মুসলিম)

এহেন উচ্চাঙ্গের চরিত্রগুণ দ্বারাই সাহাবায়ে কিরাম লালিত হন। বুখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِىْ وَلٰكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِىْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهٗ وَصَلَهَا ----অর্থাৎ যারা আত্মীয়দের অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়, তারাই আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়; বরং প্রকৃত আত্মীয়তার হক আদায়কারী সেই ব্যক্তি, যে আত্মীয়গণ কর্তৃক সম্পর্ক ছিন্ন করা সত্ত্বেও তাদের সাথে সম্পর্ক বহাল রাখে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ----এই আয়াতে বাহ্যতঃ ইতিপূর্বে অপবাদের আয়াতে বর্ণিত সেই বিষয়বস্তু পুনরায় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ

ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ اِلَّا

الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা, শেষোক্ত আয়াতের শেষে তওবাকারীদের ব্যতিক্রম এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরূপ নেই; বরং ব্যতিক্রম ছাড়াই ইহকালের ও পরকালের অভিশাপ এবং গুরুতর শাস্তি উল্লিখিত আছে। এতে বোঝা যায় যে, এই আয়াত তাদের সাথে সম্পর্কশীল, যারা হযরত আয়েশার চরিত্রে অপবাদ আরোপ করার পর তওবা করে নি। এমন কি, কোরআনে তাঁর দোষমুক্ততা নাযিল হওয়ার পরও তারা এই দুরভিসন্ধিতে অটল ও অপবাদ চর্চায় মশগুল থাকে। বলা বাহুল্য, এ কাজ কোন মুসলমান দ্বারা সম্ভবপর নয়। কোন মুসলমানও কোরআনের এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করলে সে মুসলমান থাকতে পারে না। তাই এই বিষয়বস্তু মুনাফিকদের সম্পর্কে, যারা দোষমুক্ততার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও এই অপবাদবৃত্তি পরিত্যাগ করে নি। তারা যে কাফির মুনাফিক, এ ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ নেই। তওবাকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা فَضْلُ اللّٰهِ وَرَحْمَتُهٗ বলে উভয় জাহানে রহমতপ্রাপ্ত আখ্যায়িত করেছেন। যারা তওবা করে নি, তাদেরকে এই আয়াতে উভয় জাহানে অভিশপ্ত বলেছেন। তওবাকারীদেরকে আযাব থেকে মুক্তির সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করেনি, তাদের জন্য গুরুতর আযাবের হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। তওবাকারীদেরকে اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলে মাগফিরাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করে নি তাদেরকে পরবর্তী يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ আয়াতে ক্ষমাপ্রাপ্ত না হওয়ার এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন।—(বয়ানুল-কোরআন)

একটি জরুরী হুশিয়ারী ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদের ব্যাপারে কতক মুসলমানও অংশগ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু এটা তখনকার ব্যাপার ছিল, যখন কোরআনে দোষমুক্ততার আয়াত নাযিল হয় নি। আয়াত নাযিল হওয়ার পর যে ব্যক্তি হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে নিঃসন্দেহে কাফির, কোরআনে অবিশ্বাসী। যেমন শিয়াদের কোন কোন দল ও ব্যক্তিকে এতে লিপ্ত দেখা যায়। তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহেরও অবকাশ নেই। তারা সর্বসম্মতিক্রমে কাফির।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ—অর্থাৎ যেদিন তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদের জিহ্বা, হস্ত ও পদ কথা বলবে এবং তাদের